পলিমাটি সোনাজল

যজ্ঞেশ্বর রায়

পরিবেশনা ঃ কারেণ্ট বুক সপ
৫৭এ, কলেজ ষ্ট্রীট, [illegible]-১২

পলিমাটি

লোনাজল

নীলুকে

পটভূমি

সব জাতের মধ্যেই এক শ্রেণীর মানুষ থাকে যারা অদৃষ্টের দেওয়া বাঁধা বরাদ্দে সুখী হয় না। অর্থনৈতিক কারণেই অবশ্য বাইরের আকর্ষণ তাদের কাছে ঘরের টানের থেকে বড় হয়ে ওঠে। একদিন ঘর ছেড়ে পথে নেমে আসে তারা। নিজের ভাগ্য জয় করবার প্রবল বাসনায় অনিশ্চয়ের পথে পা বাড়িয়ে দেয়। এরা দুঃসাহসী। দুঃখবিলাসীও বটে। এতে মগ মাড়োয়ারী মুসলমানের পার্থক্য নেই।

কোথায় কোন্ দূর-পশ্চিমে রুক্ষ মাটির মাড়োয়ার—জোয়ার ভুট্টা চানার দেশ, লাড্ডু আর ছাতুর দেশ, সেখান থেকে একটা লোটা হাতে আর একটা কম্বল কাঁধে চলে এসেছে ভিজে মাটি জল-জঙ্গল আর মাছ-ভাতের দেশ বাংলায়। তাও সকলেই শহরে, শহরের কাছেপিঠে, নিরাপদ জায়গায় নয়। পথঘাটহীন দুর্গম দূর পল্লী অঞ্চলেও গিয়েছে। দূর দুরান্তের দ্বীপে দ্বীপেও পা ফেলতে পেছোয়নি। অর্থাৎ যেখানেই রুজি-রোজগার ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিন্দুমাত্র সুবিধে-সুযোগ সেখানেই মাড়োয়ারী।

আর মগরা? আরাকান পার্বত্য চট্টগ্রাম আর ইরাবতীকূলের মগরা বঙ্গোপসাগরের উপকূলে নেই কোথায়? মালয় সিঙ্গাপুর থেকে পুব বাংলার লোকালয়হীন চরে চরে যেখানে শুধু বেলে হাঁস আর বালি, ইতস্তত ছড়ানো কিছু ঘাস জঙ্গল, বর্ষায় জলে থৈ থৈ, শীতেও জোয়ারের জল দিনে দুবার মাটি ধুয়ে যায়, সেখানেও টঙে টঙে ওরা। জলে মাছ ধরে ডাঙায় শুকোয়। দূরের বন্দরে চালান দেয়।

তারপর মুসলমান। সাগরের মুখে মোহনায় কোথায় দুধের সরের মত একটু চর জেগেছে চখাচখির মুখে সে সংবাদ পেয়ে অমনি লাঙল কাঁধে গরু মোষ হাঁকিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সাঁতার কেটে এসে চরে ওঠে। তাদের পায়ের চিহ্ন ধরে ধরেই যেন অতি দ্রুত চরের ভিজে মাটি সবুজ মখমলে মুড়ে দেয় ঘাস। বিন্নারঝোপ কেয়া আশশেওড়ার ঝাড় হোগলার বন যে জঙ্গল পত্তন করে মাদার শিমুল হিজল তেঁতুল বন-ঝাউ তাকে পরিণত করে অরণ্যে। চাষীর হাতের ছোঁয়ায় খেতে খেতে ভরে ওঠে ধান, কুঁড়েতে কুঁড়েতে ছায়া ছড়িয়ে গজিয়ে ওঠে নারকেল সুপারি আম কাঁঠালের বন। দেখতে দেখতে উষর বালুচর কলেবরে আর সবুজ সম্পদে বেড়ে বেড়ে সম্পন্ন দ্বীপে রূপান্তরিত হয়। রূপসী হয়ে ওঠে। এই রূপের টানেই, রূপোর আকর্ষণেই আসে মগ, শেষে মাড়োয়ারী। ক্রমশ পত্তন হয় বন্দরের। শুলুক সাম্পান যাত্রী নৌকোর গহনার নায়ে বন্দরের ঘাট গিস্-গিস্ করে। কুলি-কামিনের চিৎকার, চাষী গৃহস্থের ব্যস্ত চলাফেরা, [illegible] হাঁকডাক মগ মেয়েদের চটুল আনাগোনা—বন্দরের ধমনীতে অনুক্ষণ যৌবনের জোয়ার বইতে থাকে।

মুসলমানদের মধ্যে দুঃসাহসীরা একদল যেমন চরবিলাসী আর একদল তেমনি জলবিলাসী। ঘরের বাঁধন থেকে এদের জলের টান বড়। জীবনের বারো আনা কাল এদের জলে জলেই কাটে। জাহাজে সারেঙ সুখানি লস্কর হয়ে এরা যায় না পৃথিবীর হেন দেশ নেই। নদী-

বাংলার ঘাট থেকে ঘাটে এপার ওপার করবার কাণ্ডারীও এরাই। এদেরই ঘাসী নৌকো আর গহনার নাও কাছে পিঠের দ্বীপ চর বন্দরের মধ্যে আনাগোনা করে। ঘাসী নৌকো মাল বয়। গহনার নাও ডাক আর প্যাসেঞ্জার। শুলুক আর সাম্পান আসে অনেক দূর দুরান্ত থেকে। এরাই হল এই সমুদ্র মোহনার দ্বীপ-বন্দরগুলির সঙ্গে অবশিষ্ট পৃথিবীর ধমনীর যোগ। এ সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেলে এ বন্দর বাঁচে না। স্তন্যহারা স্তনন্ধয় শিশুর মত তিলে তিলে শুকিয়ে মরে।

পালের জাহাজ স্লুপ। পূববাংলায় বলে শুলুক। বড় বড় শুলুকে দুটো মাস্তুলও থাকে। মাস্তুল দুটোতে যখন সবকটা পাল খাটানো হয় তখন ত্রিকোণ চতুষ্কোণ সে ধবধবে পালগুলোকে দূর থেকে মনে হয় ঘনসংবদ্ধ এক ঝাঁক গাঙচিল। তেমনি একটা ঝাঁক যেন হু হু করে দিগন্ত পেরিয়ে উড়ে আসছিল মেঘনার কালো বুকের ঢেউ ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

দূরে সবুজ তুলির টানের মত ঘন নারকেল সুপারির অরণ্য দেখা যাচ্ছে। মেঘনার মোহনায় ওই হল চর নিউটন। আজ আর চর নয়। বসতি বহুল ফলে ফসলে সমৃদ্ধ বিস্তীর্ণ দ্বীপ। এক সার্ভেয়ার সাহেব এর নাম দিয়েছিলেন নিউ টাউন। স্থানীয় লোকের মুখে বিকৃত হয়ে প্রথমে সে হল নিউ টৈন। পরে নিউটন। আজ পর্যন্ত ও-ই চলে আসছে। সরকারী কাগজ পত্রেও ওই নাম। বাখরগঞ্জ জেলার ম্যাপ খুলে যদি বঙ্গোপসাগরের কূল খোঁজেন সেখানেও একটি কালো বিন্দুর গায়ে চর নিউটন নামটা দেখতে পাবেন।

এক

কার্তিকের আকাশ। আকাশের মাঝখানে মাঝে মাঝে ছেঁড়া পেঁজা তুলোর মত একটু-আধটু মেঘ। তা ছাড়া সবটুকু আকাশই গাঢ় নীল। কেবল চরনিউটনের ওপরে আকাশের নিচেকার প্রায় সব দক্ষিণ-পশ্চিম অংশটা জুড়ে সাদায় ধুপছায়ায় জড়ান বিরাট পাহাড় মতন এক বিশাল মেঘ। তার চূড়ার দিকটা যেন একটা প্রাগৈ-তিহাসিক প্রাণী। হাঁ করে আছে। পড়ন্ত বেলার সূর্য দেখতে দেখতে তারই গ্রাসের মধ্যে লুপ্ত হয়ে গেল। আর সে মেঘের নিচে চর-নিউটনের রঙ্ মুছে গিয়ে তার সবুজ অরণ্য ধূসর হতে হতে কালো হয়ে উঠতে লাগল।

শুলুকের সারেঙ ডেকে দাঁড়িয়ে। তার হাতে ছোট্ট একটা দূরবীন। দূরবীনটার সঙ্গে বাঁধা পাটের সরু দড়িটা সারেঙের গলায় পরান। হাতের দূরবীনটা চোখ থেকে নামিয়ে ভুরু কুঁচ্‌কলো সারেঙ। দূরবীনটাকে ঝপ্ করে ছেড়ে দিল শেষে। বাঁ হাতটা গায়ের নীল কোর্তার বাঁ দিকের বুক পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে টেনে বার করল ঘড়িটা। পড়পড় করে উঠল পকেট। কোণ থেকে খানিকটা বুঝি ছিঁড়েই গেল। কিন্তু ভুরুক্ষেপ নেই সারেঙের। ঘড়ি বার করে চোখ বেঁকে গেল তার। রীতিমত বিরক্ত হয়েছে সে। হালের থেকে সুখানি কি জিজ্ঞেস করবে ভেবেছিল। তার মুখ-চোখের ভাব দেখে থেমে গেল। আবার দূরবীন তুলল সারেঙ। ডাঙার দিকে তাক করল। চর-নিউটন এগিয়ে আসছে। তার গায়ে আহত ঢেউয়ের মাথায় মাথায় সাদা ফেনার সুদীর্ঘ রেখা। যেন শাঁখের বালার মত তাকে ঘিরে রয়েছে। কিন্তু ফাঁড়ি কই। ঢেউ আর হাওয়ার থেকে আড়াল করে নিরাপদে নোঙর ফেলবার মত একটা আশ্রয় চাই কাছেপিঠে। ঘড়ির হিসাবে কার্তিকের সূর্যের অস্ত যেতে এখনও প্রায় ঘণ্টাটাক বাকি।

কিন্তু তার আগেই মেঘের আড়ালে সূর্য ডুবে গেছে। তার আভায় মেঘের মাথাটা সোনালী লাল হয়ে উঠলেও মেঘের নিচে চর কালো। তার ঝাউ-হিজলের বন কাজল হয়ে উঠেছে। রাঙা মেঘের ছায়া-পড়া ঘোলা গাঙের ঘোলা আলোটুকুও হঠাৎ এক ফুঁয়ে নিবে যাবে। তখন? কোথায় সাহেবগঞ্জ। কোথায় শুলুকঘাটা। সে কিছুই দেখছে না। আজ সাহেবগঞ্জের শুলুকঘাটায় শুলুক ভিড়ান অসম্ভব। এ আলোটুকু থাকতে থাকতে কাছেপিঠে একটা ফাঁড়ি খুঁজে নিতে হবে। মগ পাড়ার কাছে একটা ফাঁড়ি ছিল জানত সারেঙ। দশ বছর আগে একদিন অচৈতন্য অবস্থায় বন্যার জলে ভাসতে ভাসতে সে-ফাঁড়ির মধ্যে আটকে গিয়ে আশ্চর্য ভাবে রক্ষা পেয়েছিল সারেঙ। তবে এও সে জানত যে, নদী-মোহনার নরম মাটির এসব দ্বীপগুলির চেহারা বছরে বছরে বদলায়। এ বছর যেখানে অথৈ পানি পরের বছর সেখানে হাঁটু জলের তলায় পলিমাটি আর বালি। একদিন যেখানে হলুদ-সোনা ধানের খেত আর একদিন সেখানে লোনা জলের পাহাড় ঢেউ। তবু অনিশ্চিত প্রত্যাশায় দশ বছর আগেকার জানা ফাঁড়িটাকে খুঁজছিল সারেঙ। খুঁজছিল মগ পাড়াটা। কিন্তু গাছ-গাছালির অন্ধকারে কোথায় যে গা ঢাকা দিয়ে গাঁটা আছে ঠাহর করতে পারছে না সারেঙ।—এই হালা। একটা লস্করকে পাছায় লাথি মেরে সজাগ করল সে।

লস্করেরা তেতে উঠেছে। শুলুকটাকে যেখানে হোক কোন মতে নোঙর করতে পারলেই তারা খালাস। তারপর পাড়ে নেমে রাতটা যা কাটাবে আজ! খুশির কলরব শুলুকে। লোভে আর প্রতীক্ষায় সকলের চোখ চক্‌চকে। পাড়ে আছে মদ। মেয়েমানুষ। একজন লস্কর বলে বসল, ডেকেই আসর জমাবে তারা। পাড় থেকে মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে আসবে। শুলুকেও মদ থাকে। তবে তা সারেঙ সুখানির জন্যে। ওদের জন্যে গাঁজা। ভাঙ। আজ ওরা মদ খাবে।

এ সময়েই লাথি। লাথি খেয়ে লস্করটা একগাল হেসে ঘুরে দাঁড়াল।—ছাব্?

সারেঙও হাসছিল, বলল—আগে ফাঁড়ি, না মদ মাগী, হমুন্দির পুত্ ? ওঠ হালা মাস্তুলে। ফাঁড়ি খোঁজ। মগ পাড়ার বগলে একটা আছিল মনে পড়তে আছে।

আজ আর শুলুক তা হলে সাহেবগঞ্জে যাচ্ছে না। হাতে খানিকটা থু থু নিয়ে দুহাতে ঘষে মাস্তুলে উঠতে লাগল লস্কর। মগ পাড়ার কাছে ভিড়বে। হাতের কাছে মিলবে সব কাঁচা ডাঁসা তাজা মাল। উৎসাহে সর্‌সর্ করে লস্করটা উঠে গেল মাস্তুলের মাথায়। সারেঙেরও তা হলে তর সইছে না। মগ পাড়াটা পাবার জন্যে উসখুস করছে। করবেইবা না কেন ? তাদের সকলেরই ত করছে। সেই পনরটা দিন থেকে তারা সকলে উপসী। হাতিয়া-সন্দীপের পর থেকেই। ঢেউ আর লোনা হাওয়া খেয়ে খেয়ে পিত্তি পড়ে গেছে তাদের সবারই।

—কিরে, দেখতে আছছ্ নিরে কিছু ? সারেঙের চিৎকারে চিন্তায় বাধা পড়ল লস্করের। সে যে মাস্তুলের একেবারে মাথায় উঠে গেছে তাই তার খেয়াল ছিল না, এবার চরের পাড়ে পাড়ে পাখির-দৃষ্টি বুলিয়ে নিতে লাগল সে। বাদা-বনের আঁধার ছায়ায় পাড়, পাড়ের জল একাকার। ফাঁড়ির ফাঁক নজরে এল না লস্করের। চেঁচিয়ে জানাল, তার চোখে কিছুই মালুম হচ্ছে না।

চটে গেল সারেঙ। গাল পেড়ে উঠল—বান্দরের ছাও লাইম্যা আয়। সুখানিকে বলল—অইতাম আমি ঠিক ফাঁড়ি বাইর কইর‍্যা ফালাইতাম্। কুঁচকনো ভুরু তুলে সে সরল সুদীর্ঘ মাস্তুলটার দিকে তাকাল। ওই ছোকরা লস্করগুলি ছাড়া কারো সাধ্য নয় মাস্তুলে ওঠে। সেও যখন লস্কর ছিল, উঠেছে। জোঁকের মত মাস্তুল আঁকড়ে তর্‌তর্ করে উঠে গেছে। আজ আর পারে না।

সারেঙের বয়স বেশি নয়। বত্রিশ চৌত্রিশ। বছর পাঁচ আগেও তার দেহ ছিল পাতলা লিকলিকে। লম্বা সরু তল্‌লা বাঁশের মত। সে রকমই ঋজু। সে রকমই রৌদ্রপোড়া। ফর্সা। হঠাৎ সে মোটা হতে লাগল। লস্কর থেকে সুখানি। তারপর সারেঙ হয়েছে সে। ক্রমশ খাটা-খাটুনি কমেছে। কিন্তু তাতেই মুটিয়ে যায়নি সে। মদ

আর মাংসই তাকে ভারি করেছে। মদ আর মাংস ভাল। তার সঙ্গে মেয়েমানুষ। তাই বলে ভারি হয়ে যাওয়া কোন কাজের কথা নয়। নিজের উপরেই বিরক্ত হয় সারেঙ। কিন্তু তার জন্যে বিরক্ত হবার মত সে নয়। পুরো সাড়ে ছ ফুট দেহের মোটা মোটা হাড়গুলি শক্ত পেশীতে মোড়া ছিল। আজ সে পেশীতে খানিকটা চর্বি লেগেছে। একমণ পঁচিশ সের দু মণ হয়েছে। অত লম্বা মানুষের পক্ষে এই টুকুন ভারি হওয়া কিছু না। এই ওজন সামান্য। বরং তাতে-করে সেদিনের পেশীর কাঠিন্য, আর হাড়-হাড় ভাবটা মিলিয়ে গিয়ে একটা নরম-নরম কোমলতা এসেছে। বাইশ চব্বিশের পাথর-পাথর যৌবনের জৌলুস নেই সত্য। কিন্তু সে পাথরকে আবৃত করে শ্যামল শেওলার আবরণটার আর এক রকম আকর্ষণ হয়েছে। বাইশ চব্বিশের বয়সে বত্রিশ চৌত্রিশের চর্বি না লাগলে যা হয় না। কিন্তু কাজের মানুষ তা বোঝে না। নড়তে চড়তে একটু অসুবিধে হলেই নিজের ওপরে বিরক্ত হয়। মাস্তুলের গায়ে বিরক্তির থু থু ছিটিয়ে সারেঙ সুখানিকে হুকুম দেয়। ফাঁড়ি না পেলে পাড় ধরে এগনর হুকুম ছাড়া আর কি দিতে পারে সে।

মস্ত শুলুক। ছোটখাট একখানি জাহাজ। দ্বীপবাসীদের নিত্য দরকারী মালে বোঝাই। চিনি চা ময়দা মনোহারী জিনিস ওষুধ তামাক যাবতীয় সব। এসব মাল খালাস করে এখান থেকে বোঝাই হবে সুপারি লঙ্কা নারকেল শুঁটকী মাছ।

তীরের শ'খানেক গজ দূরে থেকে শুলুক চলছে। গতি ধীর। হাওয়ায় বেগ কম। পালে জোর নেই। ফাঁড়ির পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। নিরবচ্ছিন্ন ফেনার মোটা রেখাটা পাড়ের চারিদিক ঘিরে আছে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে। বার দরিয়াতেই রাত কাটাতে হবে কিনা ভাবছে সারেঙ। এখানে জল বেশি নয়। হয়ত নোঙর করা যাবে। কিন্তু সারা রাত দুলবে কাঁপবে নড়বে শুলুক। হঠাৎ জোর হাওয়া দিলে বিপন্ন হাওয়াও অসম্ভব নয়। তা যদি নাও হয় তবু এত মেহনতের পরে একেবারে ঘাটে এসে বুভুক্ষু

থাকা একটা শাস্তি। কিন্তু আর এগনও বিপদ-জনক। অন্ধকারে কখন কিসে ধাক্কা লাগবে কে জানে। জমির নিকটের জলে, জলের তলায় কত গাছ-গড়ান ভেঙে পড়ে থাকে।

হঠাৎ কলবর উঠল লস্করদের। বাতি দেখা যাচ্ছে। সাহেবগঞ্জের ফাঁড়িই বুঝি। বুঝি শুলুকঘাটাই। বাতি? অন্যমনস্ক সারেঙ চমকে উঠল। সত্যি ত, বেত-চৈ-বনঝাউ-মাদারের ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে আলো। একটা মোটা তুলির লাল্‌চে হলুদ রেখা। মাঝে মাঝে গোল মতন হয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ হচ্ছে। বোধ হয়, কাঁপছে হাওয়ায়। দপ্‌দপিয়ে উঠছে। হ্যাঁ, এ শুলুকঘাটারই আলো। নয় ত এমন মোটা পল্‌তের মশাল-ডিবে আবার কোথায় জ্বলবে। মহাজনদের উঠোনে খলেনেও হতে পারে। তবে সাধারণত তারা সেখানে পেট্রোম্যাক্সই জ্বালায়। এ শুলুকঘাটার আলোই। তখনও লস্করদের কলরব চলছে। উলটো পথে এসে গেছে তারা তাই ঘাটটা তারা আগে থাকতে দেখতে পায় নি। বলল একজন। আর একজনের সন্দেহ হল আরফানগঞ্জের খালের মুখে একটা নতুন ঘাট হয়েছে। এটা সেইটে নয় ত। সে সন্দেহ প্রকাশ করতেই একজন বলে উঠল—হ রে, হইতো পারে, আমিও হুনছিলাম। মহাজন পট্টিটা পুব দিকে বাড়ছে কিনা, হেইয়ার লগ্যাই এইখানে একটা নতুন ঘাটা করছে। নানান কিছিমের দোকানপাট আর রাণ্ডি-বাড়িও আছে এইখানে। হমুন্দিরা কেবল রাণ্ডি-বাড়ির তালে আছে। ধমকে উঠল একজন: জানছ্‌ আমাগ' সাহেবগঞ্জের শুলুক ঘাটায় ভিড়নের হুকুম।

ঠেকলে আঘাটায় ভিড়নেরও হুকুম আছে, ফোড়ন কাটল তৃতীয় ব্যক্তি।

সারেঙ নিকটেই দাঁড়িয়ে ছিল, শুনছিল এদের কথাবার্তা। আরফানগঞ্জে শুলুক ভিড়ুক চাইছে সবাই। সারেঙেরও আপত্তি নেই। সাহেবগঞ্জের মহাজনদের মাল শুলুকে বেশি কিন্তু আরফানগঞ্জের মহাজনদের মালও ত আছে। অতএব আরফানগঞ্জের ঘাটে ভিড়তে দোষ কী। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্তও ত সে আঘাটায়ই শুলুক

ভিড়ানর কথা চিন্তা করছিল। আর এত ঘাটই, শুলুক ভিড়ানরই ঘাট। সুতরাং এ ঘাটেই ভিড়াবে সে শুলুক। সিদ্ধান্ত স্থির করে খুশি হয়ে উঠল সারেঙ। এই রাতে এমন আকস্মিক ভাবে এমন ঘাটেপাটে এসে যাবে ভাবতে পারেনি সারেঙ। কেই বা ভেবেছিল। একটা তৃপ্তির ঢোক গিল্‌ল সে। তখনই সে টের পেল তার গলা শুকিয়ে গেছে। গলা শুকিয়ে আছে চার দিন থেকেই। দৌলতখাঁর পর থেকেই। দৌলতখাঁ থেকেই পাড়ি। তখন ওষুধের মাত্রার মত গলায় ঢেলেছে তাতে জিবও ভেজেনি। পাড়ির সময় সজাগ সতর্ক থাকতে হয়। বেশি মদ খাওয়া যায় না। সামান্য যা পেটে পড়ে তা মগজ পর্যন্ত পৌঁছয় না। তখন সমস্ত ইন্দ্রিয় চোখ হয়ে পারের বন্দরে পড়ে থাকে। সেটা মদ খাওয়ার সময় নয়। সময় এখন। সব ফেলে, সব ভুলে, নিশ্চিন্তে গ্রাসের পর গ্রাস গলায় ঢালা যায়। বোতলের পর বোতল শেষ করা যায়। দায়িত্বের খোঁচা নেশা ছুটিয়ে দেয় না। কর্তব্য শেষের ছুটি নেশাকে বরং আরও জমিয়ে তোলে।

—এইঘাটেই শুলুক ভিড়ব। আদেশ জারি করল সারেঙ। শুনে খুশির কলরব আর ছুটাছুটি পড়ে গেল। পাল গুটান, নোঙর ফেলা, কাছি বাঁধা, অনেক কাজ এখন।

দ্বীপের অনেক ভেতর থেকে খাল এসে পড়েছে এখানে। নদীতে। খালের মুখ এখানে খুব চওড়া। গভীর। নদীর ঢেউ আছড়ে কামড়ে পাড় ভাঙে। খালের জলের খরস্রোত তার তলা খইয়ে দেয়। তাই খাল এখানে চওড়া আর গভীর। শুলুকে পেট্রোম্যাক্স জ্বালান হয়েছে। অন্ধকারে ভিড়তে গেলে পাড়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে শুলুকে চোট লাগবার ভয় থাকে। এখন বর্ষার শেষ, শীতের শুরু। বর্ষাকালে দ্বীপের জমিতে জলায় যে জল দাঁড়ায় সে জল এখন খালের পথে ছড়ছড় করে নামে। সেই জল নামার কলকল আওয়াজ ক্রমশ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে লাগল। দেখতে দেখতে শুলুক এসে পড়ল খালের মুখে। এবার খালের মধ্যে বাঁক নিল শুলুক। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন লস্কর পালের দড়ি খুলে দিল। পাল গুটিয়ে গিয়ে ছড়ছড় করে পড়ে

গেল নিচে। তারা পাল ভাঁজ করে তুলতে লাগল। দুজন লস্কর দুটো বিরাট লম্বা লগি নিয়ে গলুয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা লগি মেরে শুলুকের গতি রোধ করল। স্রোতে আর লগির চাপে গোঁ মজল শুলুকের। সে সময়ে পেছনের থেকে ভারি ভারি দুটো নোঙর ঝুপঝুপ করে জলে পড়ল। কাছি নিয়ে গলুই থেকে পাড়ে লাফিয়ে পড়ল জন চার। টানাটানি করে পাড়ের গাছের সঙ্গে কাছি বাঁধল। কাছিতে নোঙরে প্রবল টান দিয়ে শুলুক স্থির হয়ে দাঁড়াল। ছিঁড়ে যাবার মতন টান হয়ে কাছি পড়্‌পড়্‌ করে উঠল, নোঙরের শিকল করে উঠল ঝন্‌ঝন্‌। তার পরেই আবার ঢিলে হয়ে নুয়ে পড়ল কাছি। শিকল। কাজ শেষ। পেট্রোম্যাক্স নিবল। মাস্তুলের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা কালিমারা লণ্ঠন শুধু জ্বলতে লাগল টিমটিম করে। শুলুকের ক্লান্ত অবসন্ন বুকের ধুকধুকি যেন।

টিনের সুটকেসে কাঠের বাক্সে সাবান-কাচা পাট-করে-রাখা কোর্তা পিরান লুঙ্গি পায়জামা একে একে বের হতে লাগল এবার। বের হল গন্ধতেল। আতর, তুলো। মনের মতন সেজে মেজে কানে আতরভেজা তুলো গুঁজে যে যার বেরিয়ে পড়ল স্ফূর্তি করতে।

প্রথমে তারা পাড়ের চায়ের দোকানে এসে একে একে জড়ো হয়েছে, সেখান থেকে ছড়িয়ে ছিট্‌কে বেরিয়ে গেছে অন্ধকার গলির ফাঁকে ফোকরে। খুঁজতে নয়। আগে অবশ্য ভেবেছিল খুঁজতে হবে। কিন্তু হয়নি। এদের খুঁজতে হয় না। ওরাই খুঁজে বেড়ায়। ওৎপেতে থাকে। সেই ওৎপেতে-থাকা মেয়েদের হাতে হাত মিলিয়ে মুচকি হেসে মিশে গেছে একে একে সরু গলির গহ্বরে।

একা সারেঙ শুলুকে। হয় ত দুএকটা চাকর বাবুর্চি এখানে ওখানে আছে। ডেকে সারেঙ একা। একটা দড়ির খাটলি টেনে মদের বোতল চাট আর গ্লাস নিয়ে বসেছে।

রাত। একদিকে মেঘনার উঁচু উঁচু ঢেউ। তার মাথায় মাথায় ফস্‌ফরাসের ঝিকিমিকি। ধূসর অন্ধকার সুদূর সমুদ্র পর্যন্ত ছড়ান।

অন্য দিকে দ্বীপের স্তব্ধ গভীর জঙ্গল। তার ঝোপেঝাড়ে জোনাকির মিটমিটে আলো। আর কালো মিশমিশে অন্ধকার, হাতের কাছে নাক পর্যন্ত বাড়ান, যেন চুমকি বসান নীল শাড়ি একখানা চোখের সামনে ঝুলছে। পাড়ের গাছে কখনো পাখির ডানা ঝাপটানর শব্দ কখনো পাখির ছানার কিচির মিচির ডাক। জলে শুলুকের গায়ে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের ছলাৎ-ছলাৎ আওয়াজ। স্রোতের টানে পাড়ের মাটি খসে খসে পড়ার ঝুপঝাপ শব্দ। দূর মোহনা থেকে ভেসে-আসা অশান্ত সাগরের স্বর রাত্রির নির্জনতাকে আরও গাঢ় গম্ভীর করে তুলেছে। আকাশে এক ফালি হলদে চাঁদ অচল মেঘের মিনারে আটকে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে দুএকটা রাতের পাখি উড়ে যাচ্ছে। নিস্তব্ধ আকাশ তার ডানার ঝাপটায় ক্ষণেক্ষণে চকিত হচ্ছে।

বোতলের তরল আগুন গ্লাসে করে গলায় ঢেলে চলেছে সারেঙ। কখনো কখনো মাটির সানকি থেকে শুঁটকী মাছের চাট মুখে দিচ্ছে। পেটের তরল আগুন শিখায় শিখায় লেলিহান হয়ে মগজ পর্যন্ত পৌঁছেছে। মোটা গলায় গান ধরেছে সারেঙ। ক্রমশ সে গান থেমে থেমে আসছে। গলা বুজে বুজে আসছে সারেঙের। হাত পা কাঁপছে। মাথা টলছে। একবার হাতের গ্লাস গলা পর্যন্ত উঠবার আগেই পড়ে গেল নীল কোর্তায়, সাদা পায়জামায়। রাগ করে বোতল সুদ্ধই গলায় ঢেলে দিল গব্ গব্ করে। গাল গলা বুক ভিজে গেল। বোতল খসে পড়ল হাত থেকে। কাছিমের পিঠের মত ডেকের ওপর দিয়ে বোতলটা গড়াতে গড়াতে একটা কাছির স্তূপে গিয়ে ঠেকল। সেটাকে ধরতে গিয়ে সারেঙ খাটলি থেকে হাত বাড়িয়ে বেসামাল হয়ে পড়ে গেল। আধখানা শরীর খাটলিতে আধখানা ডেকে ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলতে লাগল সারেঙ। বেহুঁস। ঠোঁটের কষ বেয়ে নাল গড়াচ্ছে। কানের পাশ দিয়ে ধারার মত নেমে মধুর মত ফোঁটা ফোঁটা জমছে পাটাতনের ওপর। ফেনায় লালায় খানিকটা জায়গা ছপ্‌ছপে হয়ে উঠেছে।

কয়েকটা পায়ের শব্দ কানে এল সারেঙের। ক্ষীণ। দূরাগত। বিড়বিড় করে মুখ খিস্তি করে উঠল সারেঙ। ততক্ষণে কয়েকটা হাত

তাকে টেনে তুলে খাটলির ওপর সোজা করে বসিয়ে দিয়েছে। মাস্তুলে বাঁধা লণ্ঠনটা খুলে এনে চোখের সামনে ধরেছে একজন। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় লণ্ঠনটা কালি। তার থেকে একটা মরা-হলুদ আলো এসে পড়েছে সারেঙের মুখে। চোখে। সেই চোখে-চিমটিকাটা আলোটাকে একটা ঠেলা মেরে সরিয়ে দিয়ে সারেঙ আবার মুখ খিস্তি করল। একটি বছর সাতাশ আটাশ বয়সের মগ মেয়েকে সামনে টেনে এনে একজন বলল—খিস্তি করবান পরঅ, আগঅ চাইয়া ছ্যাহেন কেমন একহান ফরী আনছি আপনার লইগ্যা।

—এই চরর জঙ্গল-অ আবার ফরী আছে? হমুন্দী গাব গাইচ্ছা ফেত্‌নী আন্যা কছ্‌ ফরী, বাগ হালা হকুন। একটা ঠেলা মেরে সরিয়ে দিল সারেঙ লোকটাকে। কিন্তু ততক্ষণে সারেঙের বোজা চোখ অনেকটা খুলেছে। লাল টকটকে ভাঁটার মত চোখ থেকে ঝরছে লালসার জ্বালা। সেই জ্বালা নিয়ে সে দেখল মেয়েটাকে। যে চোখে পেত্‌নীকেও পরী মনে হয় এখন সেই চোখ সারেঙের। মেয়েটাকে দেখে ভালই লাগল। ফিকে গোলাপী লুঙ্গি পরনে। গায়ে সাদা মিহি ব্লাউজ। তার ছুই নিম্নপ্রান্ত পেটের কাছে অসমাপ্ত। ভেতরে সরু ছোট্ট লাল জামা। পাতলা চেহারা, লম্বা গড়ন। মুখ চোখ? একটা পাশবিক মুখ দেখবার ভয় থেকে চোখ ফিরিয়ে রেখেছিল মাশোয়ে। আর না রাখলেই বা কি হত! কালি-মারা লণ্ঠনের মরা-আলোয় তা ভাল দেখা যেত না। দরকারই বা কি? মুখ চোখ যেমনই হোক, মেয়েমানুষ ত! এখন তাই চাই তার। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল সারেঙ। মেয়েটার হাত ধরে নেমে গেল ডরায়।

—ফেত্‌নী! হালা অখন এই তোর কাছে ফরীর মতন লাগব। মুরশেদ হাত ধরে টান দিল—আয় আরশাইদ্দা গছাইয়া দিয়া গেলাম একটা, অহন আমরা নিচ্চিন্দি।

নিজেদের স্ফূর্তির মধ্যেও সারেঙকে যারা ভোলেনি তাদেরই তুজন এসেছিল। আবার চলে গেল।

ডরার সামনে এসে মাশোয়ের হাত ছেড়ে দিল সারেঙ। বন্ধ দরজাটা দু হাতে ঠেলে ভেতরে ঢুকল সে। মাশোয়ে দাঁড়িয়ে রইল বারান্দায়। অন্ধকারে। একটা গুমট গন্ধের মধ্যে।

জাহাজে যা সেলুন শুলুকে তাই ডরা—ডহ্‌রা। হাত চার পাশ, হাত ছ লম্বা একটা ফালি। খুপরি। ফুট খানেক চওড়া ফুট দেড়েক লম্বা একটা ফুকরও আছে তাতে। ওটা জানালা। এ রকমের ডরা বড় শুলুকে দশ বারটা থাকে। এটায় দু দিকে চারটে চারটে আটটা। এ গুলিতে যাতায়াতের জন্যে সামনে সরু বারান্দা। দু ধার দিয়েই বারান্দা থেকে দু তিন ধাপের সিঁড়ি নেমে গেছে শুলুকের কাঠামোর সঙ্গে আঁটা একটা পাটাতনে। প্রশস্ত পাটাতনে বিশ পঁচিশ জন শুতে বসতে পারে। এটা থাকে লস্করদের জন্যে। যাত্রী বেশি হলে তারাও ব্যবহার করে। শুলুকের পেছনে এ অংশে দু দিকে বড় বড় ফুটো মতন দশবারোটা জানালা। এ পথে হাওয়া আসে। কিছু আলোও। এ আলোর তলায় কালো অন্ধকার। যেন পাতালের গর্ত। ওখানে মাল থাকে। বারান্দা থেকে ঝুঁকে নিচে তাকান যায় কিন্তু দেখা যায় না কিছু। সেখানেও মালের তলায় পাটাতন আছে। তার নিচে শুলুকের শেষ। এ শুলুকে এখন কোন যাত্রী নেই। সব কটা ডরাই বন্ধ। অন্ধকার। যেন ঠেসেঠুসে বোঝাই-করা অন্ধকার। হাতের মুঠোয় ভরে তোলা যায় এমন ভারি। এমন ঘন নিরেট। মাশোয়ের ভয় ভয় করছিল। চারদিকে নির্জন আর এমন ভারি, ঘন, নিরেট অন্ধকার বলে নয়। সে রকমের ভয়ও না। এ ভয় অন্য রকমের। এ সময়ে এ রকমের গা সির-সির ভয় তার সর্বদাই করে। অনেক আলোর মধ্যে থাকলেও করে। থরথর করে শরীর। বুকের মধ্যে টিপটিপ করে।

এ ব্যবসায়ে অভ্যস্ত নয় মাশোয়ে। অদৃষ্টের পরিহাসে সে আজ পেশাকর। নিজের পেটের জন্যে এ কাজ সে কিছুতেই করত না। করতে পারত না। তার বিষণ্ণ দু চোখ জলে ছল ছল করে ওঠে। একটা অসহায় রুগ্ন মানুষকে একটু পথ্য দিতে হবে। একটু আরাম,

একটু শান্তি। তাই এ শাস্তি মাথা পেতে নিয়েছে সে। রেলিঙটাকে শক্ত হাতে ধরে নিজেকে তৈরি করে নিচ্ছিল মাশোয়ে। বল সঞ্চয় করছিল। এ সুযোগটা এ সময়ে সে যেদিন পায় সেদিন তার বিশেষ কষ্ট হয় না পরে। নিজেকে একটু চাঙ্গা করে নিতে পারলে যে কোন মানুষকেই তখন সামলাতে পারে সে। কে জানে কেমন মানুষ এই সারেঙ। যেমন মানুষই হোক এ সময়ে মেয়েমানুষ নিয়ে সব পুরুষই এক রকম। কঠিন, কর্কশ। পশুর মত নির্মম। নিংড়ে নিংশেষে সবটুকু রস নিয়ে তবে ছাড়ে। তারা যেন পাকা নেবু তাদের হাতে। নিজেকে প্রস্তুত করে তুলতে তুলতে সামনের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে পেছনে পায়ের শব্দের প্রতীক্ষা করছিল মাশোয়ে। তার বদলে দিয়াশালাই জ্বালবার শব্দ শুনল। চুরুটের গন্ধ এল নাকে। চুরুট ধরাচ্ছে সারেঙ। এক্ষুনি আসবে তার হাত ধরতে। মাশোয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে ঘুরে দাঁড়াল। একটু দ্বিধা করল। তারপর নিজেই এগিয়ে গেল। দু পা গিয়ে দরজা পেরিয়ে থামল।

ছোট্ট জানালাটা দিয়ে মোহনার লোনা ভিজে হাওয়া ফুরফুর করে ঢুকছে। সে হাওয়ায় দেওয়ালের পেরেকে টাঙান কোর্তা কামিজ ক্যালেণ্ডার উড়ছে, দুলছে, লুটোপুটি খাচ্ছে। কিন্তু গুমোট কাটছে না। সুপারি লঙ্কা পাট শুঁটকীর সম্মিলিত একটা কটু গন্ধ ওর দেওয়ালে জিনিস-পত্রে যেন লেপটে লেগে আছে। হাজার বাতাস এলেও তাকে ধুয়ে মুছে উড়িয়ে ফুরিয়ে দিতে পারবে না বুঝি। অবশ্য জেলে-মগ-বেবাজিয়ারা এ গন্ধে অভ্যস্ত। তাদের গাঁয়ে, টঙয়েও এই গন্ধ। তার ঘর টঙ নয়। জেলে পাড়ায়ও নয়। এমন বিদকুটে গন্ধও নেই সেখানে। তবু এ গন্ধ তার গা-সওয়া। তার বাপ মা শুঁটকীর কারবার করত। সেও করেছে এক সময়ে। যাদের এ গন্ধ নাক-সওয়া নয় তাদেরও কিন্তু কিছুক্ষণ থাকার পর সয়ে যায়। সেটা বোধ হয় এই ভিজে ফুরফুরে লোনা হাওয়ার গুণ। নিজেকে অন্যমনস্ক রাখবার জন্যে গন্ধ থেকে দৃশ্যে মন ঘোরাল মাশোয়ে। এক পাশে একটা সরু খাট। জানালার নিচে একটা ছোট্ট টেবিল। আর এক পাশে

একটা কাঠের বাক্স। টেবিলের উপরে গ্লাস বোতল, তার তলায় জলের কুঁজো। বাক্সের ওপরে কয়েকটা মলাটছেঁড়া খাতাপত্র। দেওয়ালে ঝুলনো কোর্তা কামিজ ক্যালেণ্ডারের পাশে পেরেকের সঙ্গে বাঁধা একটা লণ্ঠন্। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় তার কাচটা মেঘের মত কালো হয়ে গেছে। সে কালো আবরণের ভেতর থেকে আলো ঠেলে দিতে দিতে দুর্বল শিখাটা যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছে এমনি ধুকধুক করে জ্বলছে সে। একটা মলিন মরা আলো কোন রকমে ধোঁয়ার আবরণ ঠেলে বেরিয়ে চিমনিটার ওপরেই হুমড়ি খেয়ে আছে। তাতেকরে খুপরিটা একটা ঘোলা ছায়া-হলুদ অন্ধকারে মেখে আছে। অনুমান করা যায় সবই, দেখা যায় না বিশেষ কিছুই। যে ব্যক্তি হাত ধরে তাকে এখানে নিয়ে এসেছে, তাকেও না। সে তখন লণ্ঠনের ছায়ার নিচে তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ান। বাঁ হাতে বোতল ডান হাতে গ্লাস। টলছে। কাঁপছে। দাঁড়াতে পারছে না আর। তবু বোতল থেকে গ্লাসে, গ্লাস থেকে গলায় ঢালছে মদ। হঠাৎ বোতলের মাথায় গ্লাসটা উবুড় করে দিয়ে বোতলটা টেবিলের ওপর রেখে দিল সারেঙ। ড্রয়ারটা টেনে খুলে একটা দশটাকার নোট বার করল তার থেকে।

মজুরিটা আগেই দেয় সারেঙ। এটা তার নিয়ম। পরে যদি মদের ঝোঁকে দিতে মনে না থাকে। পরে দিতে কেমন একটা বিশ্রী অনুভূতিও তাকে পীড়া দেয়। যাকে সে ভোগ করে তার সঙ্গে তার কেবল টাকার সম্পর্ক এটা যেন সে মনে করতে চায় না। তার ভোগের আনন্দে কাঁটার খোঁচা লাগে যেন তাতে। তার মনের কোন্ নিভৃত জায়গায় ব্যথা লাগে। তাই ওই কাজটা সে আগেই সেরে নেয়। দিতেই হবে যখন আগেই দিয়ে রাখে। ওরাও তাই নেয়। ওই জন্যই ত আসা। আসল হচ্ছে টাকাটা। বাকিটা না হলেই তারা বাঁচে। কিন্তু এপথে বাঁচার প্রশ্ন নেই। মরতেই তারা এসেছে। তাই নির্বিবাদে মরে। মরে মরেই তাদের প্রাণ ধারণের সংগ্রাম। এ ক জন পুরুষ বোঝে। হয়ত কোন পুরুষই বোঝে না। একথা ভেবে

কতদিন মাশোয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেছে। আত্মবিক্রয়ের মূল্যটার দিকে তাকিয়ে এখনও দীর্ঘ নিঃশ্বাসে তার বুকটা ভরে উঠেছিল। তবু টাকাটার জন্যে সে হাত বাড়িয়েছিল। টাকাটা সে নিত। যদি না টাকাটা দিতে এসে সারেঙের মুখটা লণ্ঠনটার অত কাছে যেত। লণ্ঠনের মুমূর্ষু শিখাটা কাঁপছিল। সেই থরথরে শিখার কুয়াশা কুণ্ডলীর সামনে কতকগুলি কঠিন মোটা আঁকিবুঁকিতে তীক্ষ্ণ সারেঙের তামাটে মুখটা বড় বেশি চমকে দিল মাশোয়েকে। তার বাঁ হাতটা তার ঠোঁটের কাছে উঠে এল, পিছন দিকে বেঁকে গেল ঘাড়টা শরীরটা। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল। হাঁ হয়ে গেল মুখ। তার গলা চিরে একটা অস্ফুট ভয়তরাসে স্বর বেরিয়ে এল। সে মুখ ফিরিয়ে পালাতে যাবে এমন সময় সারেঙের কঠিন কড়কড়ে হাতটা তার সরু নরম কব্জির মধ্যে চেপে বসল।

একটা নিষ্ঠুর টান খেয়ে একটা মাংসের ডেলার মত মাশোয়ে আছড়ে পড়ল সারেঙের বুকে। সেই মুহূর্তেই সারেঙ তাকে জাপটে ধরল। মুক্তির পলায়নের আর কোন উপায়ই রইল না মাশোয়ের। মাশোয়ের তুলো-নরম শরীরটা নিয়ে ভাদ্রের কুকুরের মত খেপে উঠল সারেঙ। আর, একটা ঠাণ্ডা রবার-অবয়বের মত সেই খেপামির কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে নিঃসাড় হয়ে গেল মাশোয়ে। তবু কিছু চেতনা অবশিষ্ট ছিল মাশোয়ের। সেই অস্ফুট চেতনার অন্ধকারে সে অনুভব করছিল সব ছারখার করে দেওয়া ঝড়ের উল্লাস। উন্মত্ত উন্মথিত কতগুলি মুহূর্তের প্রচণ্ড ঝাপটা। সেই রুদ্ধশ্বাস ঝড়ের উত্তেজনা যখন থামল মাশোয়ের আহত বিপর্যস্ত শরীর জুড়ে নেমে এল ঘুম। সেই অতিক্লান্ত দেহের ঘুমের মধ্যে কখন যে রাত কাবার হয়ে গেল জানতে পেল না মাশোয়ে। তার যখন ঘুম ভাঙল শেষ রাতের ঠাণ্ডা হাওয়া তখন ছোট্ট জানালা দিয়ে সর্‌সর্‌ করে ঢুকছে। আর একটু পরেই আকাশ রুপোলী হবে। তারপরে সূর্য উঠবে সোনা ছড়িয়ে।

মাশোয়ে উঠল। বিবশ দেহ টেনে উঠে দাঁড়াল সে। পোষাক পরল। চুলে চিরুনি চালিয়ে নিল। মেঝেতে হাওয়ায় তখনও কর-

ফর ফর করছে দশটাকার নোটটা। একবার এদিকে আসছে। থামছে। আবার ওদিকে যাচ্ছে। মাশোয়ের শুকনো মুখ আরও শুকিয়ে উঠল। ক্লান্ত চোখে নেমে এল আরও ক্লান্তি। বিষণ্ণতর হয়ে উঠল সে। তবু চলে যেতে পা বাড়াবার আগে নোটখানি তুলে নিতে হল তাকে। ডাঙায় একটা নিরানন্দ ঘরের ছবি ভেসে উঠল তার চোখে। একান্ত মুখাপেক্ষী একটি রুগ্ন মানুষের মুখ। নোটখানি তুলে নিল মাশোয়ে। শেষবারের মত ঘুমন্ত সারেঙের মুখের দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে বেরিয়ে এল।

দুই

জল-কালি-ফিকে ভোরের অন্ধকারে ডানা মেলে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে নিশ্চুপ কয়েকটা পানকৌড়ি, বক, বুনো-হাঁস। মাশোয়ের যেন তাদের সঙ্গেই পাল্লা। তেমনি লঘু নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে চলেছে মশোয়ে। মাইল তিনেক পথ হাঁটতে হবে তাকে।

খালের পশ্চিম পাড় ধরে সড়ক। দোকান পসার মহাজনদের গদি। খাল পার হলে হাট। সেখানে তাল গাছের তক্তার উঁচু পুল। এ পুল পেরিয়ে একটা রাস্তা চলতে চলতে নদীর নিকটে পর্যন্ত এসে হঠাৎ বাঁক নিয়েছে বেবাজিয়া-জেলে পাড়ার দিকে। সে বাঁকের মুখে নদীর বালি-পাড়ের এক টেরেতে নারকেল সুপারি কাঁঠাল জামরুলের বন। সেখানে মেহেদি পাতার বেড়ায় ঘেরা ছোট্ট বাড়িটি মাশোয়ের।

আজকের মত আর কোনদিন সে করে নি। বাড়ি ছেড়ে রাত কাটায় নি কোনদিন কোথাও। বাড়িতে এক বুড়ীর জিম্মায় রোগী। রতনলাল। আনচান মন মাশোয়ের। ওই পানকৌড়ি বক বুনো-হাঁসের মত উড়তে পারলে যেন বাঁচত সে। সেই ব্যস্ত উড়ন্ত মন হঠাৎ দিক পালটাল, থমকে দাঁড়াল দু মাইল এসে পায়রাডাঙার সাঁকোর কাছে। একটা খোড়া খাল। তারই পুব পাড়ে অনেক দূরে নদীর কাছাকাছি আছে কয়েক ঘর জেলে আর চাষী। যাতায়াতের

সুবিধার জন্যে তারাই এখানে সাঁকো বেঁধেছে। এ সাঁকো পেরিয়ে উত্তর মুখো গেলে মাশোয়ের বাড়ি মেলে। মাশোয়ের বাড়ি ছাড়িয়ে বেবাজিয়া জেলে-পাড়া। কিন্তু সেই উত্তর প্রান্তের মানুষেরা সহজে এ পথ মাড়ায় না। এ পথে শুলুকঘাটার দূরত্ব হয়ত একটু কম। তবু না। বাজার হাট, পরিচ্ছন্ন পথঘাট, লোকালয় ফেলে শেয়াল সাপে ভরা এই বনজঙ্গল ভাঙতে চায় না কেউ। মাশোয়েও না। আজ পাঁচ বছর সযত্নে সে ঐ পথ এড়িয়ে চলেছে।

সাঁকোর সামনে মুহূর্তকাল দ্বিধায় দাঁড়িয়ে ছিল সে। তারপরেই কিসের এক অদৃশ্য আকর্ষণে সাঁকো পার হয়ে গেল মাশোয়ে। গাছপালা ঝোপ-জঙ্গল দীঘি দ্রুত পায়ে পার হয়ে এসে দাঁড়াল একটা উঁচু ভিতের ওপরে। পুব দিক লাল হয়ে উঠেছে। একটা মেঘের পাহাড় ডিঙিয়ে উঠে আসছে লাল টুকটুকে সূর্য। সে লাল ক্রমশ হলদে হচ্ছে। বদলে যাচ্ছে রুপো রঙের দিকে। ডাল-পল্লবের ফাঁক-ফোকর দিয়ে ছেঁড়াখোঁড়া সে লাল-হলুদ-রুপো আলো জাফরি কেটে ছড়িয়ে পড়েছে গাছে ঝোপে দূর্বায়। গাছের ডাল পাতা নাড়া দিয়ে ভোরের বাতাস ঝিরঝির করে বয়ে যাচ্ছে। কাক কোকিল ডাকছে। ফিঙে শালিক ঘুঘুগুলি ডালে আকাশে উড়ছে লাফাচ্ছে। এই গান আলো আনন্দের মধ্যে এখানে ছিল তাদের পাতার কুঁড়ে। একদিন সে-কুঁড়েতে স্বর্গ নেমে এসেছিল মাশোয়ের জীবনে। দুর্লভ সেই সুখ বেশি দিন ভোগ করবার সৌভাগ্য ঘটে নি মাশোয়ের। নির্মম নিয়তি তার অদৃশ্য হাত বাড়িয়ে একদিন মাশোয়ের বুক থেকে তার মনের মানুষটিকে কেড়ে নিয়ে গেল। অনেকদিন পরে স্বর্গের সেই সুখ-স্মৃতিই বুঝি বড় ব্যাকুল করে টেনে নিয়ে এসেছে তাকে এখানে। স্মৃতির গহনে সাঁতার কাটতে ছুটে এসেছে মাশোয়ে। ডুব দিয়ে কোন হারিয়ে যাওয়া রত্ন খুঁজতে চাইছে।

কয়েকটা ঘুঘু শালিক নেমে এসেছে মাটিতে। ঝোপ-জঙ্গল ঘাসের মধ্যে ঠোঁট গুঁজে গুঁজে একটু একটু পরেই কি তুলে তুলে খাচ্ছে। পোকা। ঘাসের বীজ। বোধ হয় যা পাচ্ছে। সেই দিকে তাকিয়ে

থাকতে থাকতে হঠাৎ মাশোয়ে শিউরে উঠল। অমৃতের সমুদ্রে স্নান করতে এসে যেন বিষের জলে গা ভিজিয়ে ফেলল। কচুগাছে ঘেঁটু গাছে ফণীমনসায় আচ্ছন্ন ভিতটা, যেন সমস্ত অতীতটাকেই তারা আড়াল করে ঢেঁকে বসে আছে। তবু তার মধ্যেথেকে উঁকি মারছে পোড়া-কাঠ খুঁটি। ভস্মাবশেষ। নিজের হাতে নিজের স্বর্গের স্মৃতিকে পুড়িয়ে দিয়ে মাশোয়ে ভেবেছিল সে তার সমস্ত অতীতকেই সে-আগুনে ভস্ম করে ফেলেছে। কিন্তু আজ হঠাৎ সে আবিষ্কার করল সংসারে সব কিছুকেই পুড়িয়ে একেবারে ছাই করে ফেলা যায় না। কিছু তার অবশিষ্ট থেকে যায়। কিন্তু সেই অবশিষ্ট কিছু যে এমন বিশ্রী আর বীভৎস, চোখের সামনে সে যে এমন মুখখিঁচিয়ে সব সময় ব্যঙ্গ করতে থাকে তা সে জানত না। আজ এই নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মাশোয়ের সমস্ত সত্তা বারবার কেঁপে উঠতে লাগল। মাশোয়ের অন্তরের যত কিছু সৌন্দর্য সুষমা সেদিনের সেই আগুনে সবই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পড়ে আছে ওই পোড়া-কাঠ খুঁটিগুলির মতই কুৎসিত তার এই রক্ত মাংসের কদর্য দেহটা মাত্র। পুরুষের ভোগের পণ্যটা শুধু। মাশোয়ের আর সহ্য হচ্ছিল না। দাঁড়াতে পারছিল না চোখ মেলে। অসহ্য জ্বালায় উদভ্রান্ত হয়ে সে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে এল।

বন ছাড়িয়ে খানিকটা ঢালু বালি প্রান্তর। বন্ধ্যা। ফণী-মনসা আর আশশেওড়ার এখানে একটা আর ওই ওখানে একটা ঝোপ। বাকি সব শূন্য খাঁ খাঁ। এই অসহ্য শূন্যতার জ্বালা যেন জলের মধ্যে ডুব দিয়ে জুড়তে চায় জমিটা। কালো ঘোলা লবণাক্ত ঢেউয়ের তলায় তাই সে অল্পে অল্পে নেমে গেছে। এমনি করে সে বুঝি একদিন উষর জীবনের সবটুকু জ্বালা জুড়বে তার সমস্ত দেহটা ডুবিয়ে। সে তলিয়ে যাবে। আর উঠবে না। মাশোয়ে একটু থামে। কী ভাবে। হয়ত তুলনা করে জমিটার সঙ্গে জীবনের। হয়ত ভাবে ওই মোহনার ঠাণ্ডা লোনা জলে সেও ঝাঁপ দেবে। আর উঠবে না। বেদনার দাহে পোড়া নিষ্ফল জীবনের বিড়ম্বনা সে আর সইতে পারছে

না। বইতে পারছে না। সে মরবে। সে ছুটে যায় জলের ধারে। ঘোলা জল। দুরন্ত ঢেউ। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার আকুতি। দেখতে দেখতে হঠাৎ রোগশয্যায় নিঃসঙ্গ রতনলালের শীর্ণ মুখটা মনে পড়ে। মরা হয় না। আঁজলা ভরে জল মুখে চোখে ছিটিয়ে দেয়। বিন্দু বিন্দু জল চুলে কানে নাকের ডগায় চোখের পাতায় আটকে থাকে। মাশোয়ে আবার ছোটে। নিকটে গাছ-গাছালির ফাঁকে টালির চাল। মেহেদি পাতার বেড়া। তার মধ্যে মিলিয়ে যায় মাশোয়ে।

বুড়ী মা চান করে এসে কাপড় মেলছে। মাশোয়ে উঠোনে এসে পা দেয়। তাকে দেখে নিকটে এগিয়ে এসে খবর দেয় বুড়ী মা : রতন ভাল আছে, এখনো ঘুমাইতে আছে। একটা দুশ্চিন্তা-নামা আরাম ছড়িয়ে যায় মাশোয়ের মুখে চোখে। প্রায় দৌড়ে এসে ঘরে ঢোকে সে।

রতনলাল ঘুমুচ্ছে। কপালে নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম। এই কার্তিকের রাতে হিম-হিম ঠাণ্ডায়ও রতনলাল ঘামে। মাশোয়ের চোখ রতনলালের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ছলছলিয়ে উঠল। একটা নিশ্বাস ফেলে নিজের রুমাল দিয়েই তার কপাল নাক গলা মুছে দিল। নাড়া লেগে জেগে উঠল রতনলাল। উঃ, বলে ডান দিক থেকে বালিশের বাঁ দিকে মাথা ঘোরাল। একটু পরে কাত হল। মাথা পড়ে গেল বালিশ থেকে। সে-মাথা বালিশে তুলে দিতে দিতে রতনলালের পিঠে চোখ পড়ল মাশোয়ের। ঘামে গায়ের ফতুয়া বিছানার চাদর ভিজে গেছে। ইস্! এই ঠাণ্ডায় সারারাত ছিল। একটা গামছা টেনে এনে ফতুয়ার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল মাশোয়ে। মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল সে। আবার হয়ত সর্দি লাগবে। জ্বর হবে। উঠবে গয়ার। রক্ত। মাশোয়ের চোখ ছাপিয়ে দু ফোঁটা জল শিশিরের বিন্দুর মত তার নিজের হাতেই ঝরে পড়ল। রতনলাল চোখ না খুলেই শুধোল—কখন এলে? রাতে আমি তোমায় খুঁজেছিলাম। মাশোয়ের মুখে একটা ব্যাথা ফুটে উঠল। কালো মুখ করে চোখ ফিরিয়ে নিল সে। ধীরে ধীরে শুধোল—ক্যান খুঁজছিলা?

—ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তেষ্টাও পেয়েছিল খুব। জল খেতে তোমার ঘরে গিয়েছিলাম।

—আমার ঘরে জল খাইতে গেছিলা ক্যান্, এই ত দেখি গ্লাস ভর্তি জল। হাতের কাছে জল। হাতের কাছে সব। তবু তুমি বিছান্ ছাইড়া ওঠ? বুড়ী মাকে ডাকতে পার না? তুমি যদি ফির এই রকম কর, আমি যে দিকে দুই চোখ যায় যামু গিয়া। আর আসুম না।

রতনলাল বালিশের এপাশ থেকে ওপাশে মাথা দোলাতে দোলাতে বলল—ইস্ আমাকে ফেলে তুমি যাবে? যাও ত!

মাশোয়ে অদ্ভুত এক দৃষ্টি পেতে দেখছিল রতনলালের মাথা দোলান। হঠাৎ আর থাকতে পারল না। ঝাঁপিয়ে পড়ল রতনলালের পাশে। মাথাটা আলগোছে তুলে নিল কোলে। তার চুলে কপালে হাত বুলোতে লাগল।

—আঃ কি আরাম, কি ঠাণ্ডা। রতনলাল চোখ বুজল। মাশোয়ে বুকের মধ্যে চিৎকার করে উঠল: না না তোমারে ছাইড়া আমি যামু না, যাইতে পারুম না!

একটা উচ্ছ্বসিত কান্না ডেলা মতন হয়ে গলায় এসে ঠেকল, তাকে প্রবল চেষ্টায় ঢোক গিলে চেপে ফেলল মাশোয়ে। পরম মমতায় রতনলালের গালে একটা চুমু খেল সে। রতনলালের গালে তার ঠোঁট লাগার সঙ্গে সঙ্গে গত রাত্রির মানুষটা যেন মূর্তি ধরে সামনে এসে দাঁড়াল। ছবির মত ভেসে উঠল পায়রাডাঙার জঙ্গলে তাদের দশ বছর আগেকার দিনগুলি। কিন্তু, না না না। সে-মূর্তি সে দেখবে না। ভাববে না সে তার পায়রাডাঙার দিনগুলিকে। রতনলালকে সে আরও বেশি করে জড়িয়ে ধরল। আরও নিকট করে। এই সত্য। এ-ই বাস্তব। এ-ই তার সাত রাজার ধন। রতনলালকে সে আদরে আদরে অস্থির করে তুলল। কিন্তু কখন যে তার চোখ ছলছলিয়ে উঠেছে, চোখের কোণ বেয়ে তা নেমে এসেছে গালে, ঝরে পড়েছে রতনলালের গায়ে, জানতেও পারেনি মাশোয়ে। হঠাৎ রতনলাল বালিশে কনুই

ভর করে উঠে তাকাল : ও কি, তুমি কাঁদছ, কেন ? রতনলালের মুখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল মাশোয়ে। একটা মার-খাওয়া ভীরু বেড়ালের মত সে উঠে পালিয়ে গেল। তার প্রশ্নের কোন জবাব দিল না।

রতনলাল বালিশে মাথা রেখে বিমর্ষ হয়ে রইল। তার জন্যেই মাশোয়ের আজ এই দশা। রাত জেগে জেগে কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে দিন দিন। দিন রাত কাজ মাশোয়ের। দিনে সারাদিন সে তার সেবায় ব্যস্ত। রতনলাল বিছানা থেকে ওঠে না। ডাক্তারের বারণ। অতএব সব কিছুই তার হাতে তুলে দিতে হয় মাশোয়েকে। ওষুধ পথ্য পানীয় সবই মাশোয়ে এনে কাছে দিলে, গুছিয়ে ব্যবস্থা করে দিলে, তবে সে খেতে পারে। খায়। তার স্নানের মুখ ধোয়ার জল দেওয়া, ছাড়া জামা কাপড় ধোয়া, বিছানা পরিষ্কার করা, বদলান, রোদে দেওয়া থেকে একটা বিছানায়-পড়ে-থাকা রোগীর জন্যে কত শত কাজ। সে সবই খুঁটে খুঁটে করে মশোয়ে। প্রতিটি কাজে কি গভীর নিষ্ঠা, তন্ময়তা। কাজে-ব্যস্ত মাশোয়কে মুগ্ধ হয়ে দেখে রতনলাল, দেখে তার মমতা-মগ্ন মুখ। চোখ। ছোট্ট কোঠাখানা কি ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার, খট্‌খটে শুক্‌নো। আয়না, আল্‌না, আলমারি—কি ছিমছাম গুছোন। পরিপাটি। কাজে-ব্যস্ত মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয় মশোয়ের। নিজেই সে তা তার আঁচলের খুঁটে মুছে ফেলে। রতনলাল আপসোস করে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সে উঠে গিয়ে নিজে হাতে মুছে দিতে পারল না তার মুখের ঘামটা।

হ্যাঁ। মাশোয়ে যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, সারাদিনই থাকে, থাকে শাড়ি পরে। এই বন্দরেরই জোলাদের তাঁতে বোনা মোটা খসৃখসে শাড়ি। লুঙ্গি পরলে ব্লাউজ পরতে হয়। খরচ বেশি। খরচের জন্যেই যে মাশোয়ে এখন আর বাড়িতে লুঙ্গি পরে না রতনলাল তা জানে। কিন্তু মাশোয়ে তা স্বীকার করে না। সে বলে সে যে লুঙ্গি পরে সেই তার গুণাহ্‌। এ তার জাতের পোষাক নয়। তার তবে জাত কি ? রতনলাল শুধোয়। মাশোয়ে মনে মনে শিউরে ওঠে।

মনে মনে বলে তার জাত নেই। কুল নেই। সে বেজন্মা, বাস্তা। কিন্তু মুখে বলে, ঠিক বলে না, গলা থেকে কথাটা জিব দিয়ে তুলে এনে যেন ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ঠেলে বার করে দেয়—মুসলমান বাস্তা। একটু থেমে হেসে ওঠে—আমার হাতে খাইয়া তোমার জাইত গেছে।

—প্রাণ বেঁচেছে। রতনলাল হেসে জবাব দেয়। আমার জাত, সভ্য সমাজ, আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। মরতে পাঠিয়েছিল এখানে। যেখানে খুশি। তুমি যদি বুকে তুলে না নিতে। তোমার কোলে আশ্রয় না পেতাম। আমি মরতাম। ওই মেঘনার জলেই ঝাঁপ দিতাম তবে।

ক

মাশোয়ের মনে পড়ে। রতনলাল বলত—তোমাকে আমি চাই মাশোয়ে। তোমাকে না পেলে, তুমি যদি আমার না হও তা হলে ওই মেঘনার জলে আমি ডুবে মরব।

আ মরণ, মরতে যাবে কেন লোকটা তার জন্যে : ভাবত মাশোয়ে : সে কে তার? ওর কি আর কেউ নেই। এমন হ্যাংলা-পনা করছে কেন, বেকুব লোকটা? বেআক্কেলের মত, বেশরমের মত কেন কেবল ঘুরঘুর করে অনূজাত বাস্তার আশেপাশে। কেন কেবল ফিরে ফিরে চায়। তাকে চায়। ভাবত মাশোয়ে। বিরক্ত হত। মায়ের আরাকানী রক্ত বেগে বইত শিরায় শিরায়। বাপের বাঙালী রক্ত অবশ্য তাকে থিতিয়ে দিত একটু পরেই।

মাশোয়ের মা বোঝাত।—লোকটার কেউ নেই, কিন্তু টাকা আছে। তোকে বাড়ি করে দেবে। জমি করে দেবে। সুখে রাখবে। আদর আত্তি করবে। ভাল খাওয়াবে, পরাবে।

ভাল খেতে পরতে চায় না মাশোয়ে। সুখ যত্নেরও দরকার নেই তার। না, না। আধপেটা ভাত ছেঁড়া লুঙ্গি ব্লাউজ এই

ভাল তার। এ-ই বেশ। মাকে শুনিয়ে দিয়েছিল মাশোয়ে। কিন্তু বুড়ো বাপের কথার জবাবে কিছু জোগায় নি তার মুখে। কথাটা এখনও ঝনঝন করে বাজে মাশোয়ের কানে—সেইয়াই তোরে জুটাইয়া আইন্যা দিতে পারি কই মাইয়া। যা। কথা শোন। ওই লোকটার লগে থাক গিয়া। তুইও বাঁচবি, আমরাও বাঁচুম।

বৃদ্ধ বাপের মুখে চোখে কি দেখেছিল সেদিন মাশোয়ে, রাজি হয়ে গেল। না। মাশোয়ে নিজেও ভেতরে ভেতরে অসহায় হয়ে পড়ছিল। বুড়ো বাপ বুড়ো মা আর তাকে খাওয়াতে পরাতে পাহারা দিতে পারছিল না। তবু মাশোয়ে বিচলিত হয় নি। অতন্দ্র চোখে মেঘনার কালো জলের দিকে তাকিয়ে তার বুকের উত্তাল ঢেউ দেখেছে। দেখেছে তার বুক ছুঁয়ে উড়ে-যাওয়া বুনোহাঁস, মাছ খুঁজে ঘুরে বেড়ান গাঙচিলকে। তার বুকের অনেক ওপরে স্তব্ধ মেঘকে। অনেক ঝড়ের রাতে বাতাসের হাহাকার বিনিদ্র চোখে প্রহর জেগে দেখেছে শুনেছে মাশোয়ে। আর কারো দিকে তাকায় নি। কারো কথা ভাবে নি।

কিন্তু রতনলালকে ঠেকানো গেল না। শিক্ষিত। সুন্দর। টাকাওলা। রতনলালের মোক্তার হয়ে এসে মা জানতে চেয়েছিল: বুড়ো বাপমায়ের ভরসায় চিরকাল মাশোয়ে এই প্রতীক্ষার দিনগুলি এমন নিশ্চিন্তে কাটাতে পারবে কিনা? ভেবে দেখেছে সে, পাড়ার ফচকে ছোঁড়াদের সে ঠেকাবে কেমন করে? ছোঁড়াগুলো বুড়ো মানুষটাকে মানে গণে তাই, নইলে, এমন তেমন যদি কিছু বেচাল করে ঠেকাবে কে? কে ঠেকাতে গিয়ে মার খাবে। মা রাগ করে বলে উঠেছিল—আসলে মাশোয়ে চায় তাকে বারোভূতে চেটেপুটে খাক।

তবু যখন কিছুতে কিছু হচ্ছে না, মেয়ে টলছে না এক চুল, মা একদিন পাড়া মাথায় করে চেঁচিয়ে উঠল—অনেক ছিনালনি করছস ছোইয়া অখন ছ্যাক দে। বাত্যার মাইয়ার লগে পিরিত কইরা কোন্ ভাউরা তার মাউগ পোলা থুইয়া চরে পইড়া থাকব শুনি? গাংগে ভাইস্যা আইছিল গাংগে ভাইস্যা গেছে। তুই পথ

চাইয়া থাকলে কি হইব সে লোক তোরে ভুইল্যা গেছে। তোর বাপ ভোলে নাই তোর মায়রে। .....

এখনকার এই যে মুসলমান বাপ এ তার নিজের বাপ নয়। তার বাপ দৌলতখাঁর গুপ্তের বাজারের সোমনাথ গুপ্ত। এক ডাকসাইটে জমিদারের ছেলে। একদিন তিনি বরিশাল থেকে নৌকোয় করে দৌলতখাঁ আসছিলেন। বছর তেইশ চব্বিশ আগেকার কথা। ভেলুমিয়ার চরে তখন সূর্য ডুবু ডুবু। পশ্চিম আকাশটা সিঁদুরে লেপা। তার রঙ কাঁপছে রোয়া খেতের ধানে, কেয়া হোগলার জঙ্গলে আর কালিজিরার ঘোলা জলে। গুপ্তবাবু বললেন—নৌকা বাঁধ। বেলে হাঁস মারব। হাঁস মারতে বন্দুক নিয়ে তিনি নেমেছিলেন চরে। হাঁস মেরেছিলেন কিনা জানে না মাশোয়ে। তবে জানে, নিজেই মরেছিলেন তিনি। মজেছিলেন। বুকের কোথায় বিঁধে গিয়েছিল তাঁর মায়ের গলার ধারাল হাসি।

মায়ের তখন বয়স আর কত, বছর পঁচিশ কি তার কাছাকাছি। গায়ের রঙ কাঁচা হলুদের মত। দেহের বাঁধন বিশ বছরের ছুঁড়ির। ছেলেপুলে ছিল না তার। ষোল বছর বয়সে আরাকান থেকে তাকে নিয়ে ভেগেছিল চট্টগ্রামের এক মুসলমান। পূব বাংলার চরে চরে ঘুরে তিন হাত পিছলে কালিজিরা নদীর এক বেদের নিকা করা বউ সে তখন।

তাঁকে দেখে হাসে নি মা, হেসেছিল তার এক সঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে, কি একটা রসিকতার জবাবে। দু জনে নদীর জলে চান করছিল নৌকোর আড়ালে। শরীরে কাপড় ছিল না। সোমনাথকে আসতে দেখে সঙ্গিনী সাবধান করেছিল কৌতুক করে। তারই জবাবে তাচ্ছিল্যের সেই হাসি। সে হাসি বিঁধেছিল সোমনাথের কোথায় যেন। তিনি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। হাতে বন্দুক সবল সুন্দর এক পুরুষের সামনে মুহূর্তের জন্যে মাশোয়ের মার মত মুখরা বেবাজিয়াও থতমত খেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে-

মুহূর্ত পার হয়ে যেতেই ঠোঁটেও বাঁকা হাসি ফুটে উঠেছিল।—অমন কইরা চাইয়া থাকলে ট্যাকা দেওন লাগব।

—দেব, ওঠ্ জল থেকে, বলেছিলেন গুপ্তবাবু।

—আ মরণ, কাপড় নাই যে পিন্দনে।

—না থাকুক, ওঠ্।

—কি, ধমকাইয়া উঠাইবান নাকি ?

—হ্যাঁ।

—উঠুম না।

—না উঠলে গুলী করব।

—করেন। হাঁটু জলে নগ্ন বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিল মা। জলপরীর মত। তাই দেখে পাগলা হয়ে গিয়েছিলেন সোমনাথ। জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ততক্ষণে নায়ের পুরুষরাও এসে পড়েছিল। কিন্তু মনিবকে দেখে কারো মুখে রা সরে নি।

মাশোয়ের মাকে নিয়ে সেদিন থেকে জগৎ সংসার ভুলে গেলেন সোমনাথ। মায়ের অনুরোধ, বউয়ের কান্না, বাপের শাসানি, ত্যজ্যপুত্র করবার হুমকি, কিছুতেই মাশোয়ের মায়ের থেকে তাঁকে কেড়ে নিতে পারে নি। তবু বছর পাঁচ পরে তার বাবা চলে গিয়েছিলেন। মাশোয়ের বয়স তখন সাড়ে চার বছর। মাশোয়েকে বড় ভালবাসতেন তিনি। মাশোয়ে নামও তিনিই রেখেছিলেন, কার বইয়ে পড়ে নামটা তাঁর খুব ভাল লেগেছিল। বাবার আদর আজও মনে আছে তার। কোলে-পিঠে করে ঘুরতেন, নানা গল্প বলতেন, ছড়া কাটতেন। একটা ছড়া এখনও মনে পড়ে মাশোয়ের। বড় জেদী আর আবদারে ছিল মাশোয়ে। আর একটুতেই হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসত, কিছুতেই শান্ত হতে চাইত না। বাবা তখন তাকে কোলে নিয়ে ছড়া কাটতেন :

কোলে উঠ্যা মাইয়াটা চাটে বস্যা লোলাটা,
খ্যান খ্যানাইয়া কান্দে, মায় বস্যা রান্দে॥

এমনি ছড়া মুখে মুখে বানাতেন বাবা। মোটা মোটা বই থেকেও নানা ছড়া শোনাতেন। মাশোয়ের মনে করে রাখবার শক্তি ছিল

আশ্চর্য রকম। বার পাঁচ-সাত শুনলেই বড় বড় ছড়া, কবিতা মুখস্ত করে ফেলতে পারত। আর তার সে স্মরণশক্তি দেখে উৎসাহ পেয়ে বাবা তাকে কত আদর করতেন। কত শেখাতেন। ওই টুকুন বয়সেই সে অনেক শিখেছিল।—ফলা বানান গুণ ভাগ তক। কিণ্ড প্রাইমার নামে একটা ইংরেজী বই পর্যন্ত মুখস্ত করে ফেলেছিল সে। বাবা বলতেন, কলকাতা নিয়ে গিয়ে তিনি তাকে মেমসাহেবের স্কুলে পড়াবেন। সেখানেই থাকবে সে। মেমের মতই সুন্দরী ছিল মাশোয়ে। আজকের এই চরের লোনা জলে কড়া রোদে এমন তামাটে হয়ে গেছে।

এমন মেয়ে-অন্ত-প্রাণ লোকটি, হঠাৎ তাকে, তার মাকে ফেলে চলে গেল। যাবার আগে অনেক চিঠিপত্র পেয়েছিলেন তিনি। খুব গোমড়া হয়ে থাকতেন। কী ভাবতেন। কোথায় যেন মনের মধ্যে ব্যথা পাচ্ছিলেন তিনি। একদিন চলে গেলেন। অনেক আদর করে, অনেক রঙিন শাড়ি, খেলনার লোভ দেখিয়ে। আর এলেন না। বাবা মাকে নিয়ে এসেছিলেন পদ্মার পারের এক নাম-করা বন্দরে—চাঁদপুরে। যে ক দিন ছিলেন সেখানেই ছিলেন তিনি তাদের সঙ্গে। তাঁর চলে যাবার কয়েক দিনের মধ্যেই অভাব দেখা দিল, আর দেখা দিল নানা অচেনা মুখ। তারা কেউ অনেক রাত পর্যন্ত থাকত, কেউ রাত কাবার করে চলে যেত। তাদের মধ্যে একজন দুঃসাহসী মুসলমান জেলে তাকে সুদ্ধ তার মাকে জোর করে তুলল তার নৌকোয়। সেই থেকে আবার মায়ের বেদে জীবনের শুরু। অনেক ঘাটে ঘুরেছে তারা। মাকে নিয়ে লোকটা কোথাও নিশ্চিন্ত থাকতে পারে নি। যারই নজরে পড়েছে সে-ই মাকে কেড়ে নিতে চেয়েছে। লোভী চক্ষুর অগোচরে তাই মাকে নিয়ে লোকটা এই চরে বেদেদের মধ্যে এসে টঙ বেঁধেছে। সে বছর আঠারো আগেকার কথা। তার এই বাপের গায়ে জোর ছিল, পয়সা ছিল না। অভাবে আর অসুখে মায়ের গায়ের রঙ ফিকে হয়েছে, শরীর ভেঙে গেছে। আজ ত সে বুড়ীই। তার বাপের শরীরেরও সেই তাগদ

নেই। গাঁজা ভাঙ করে করে শুকনো আদা হয়ে গেছে। রূপ থাকতে অভাবের তাড়নায় এখানে এসে মা শরীর বেচত। এখানে বেদেনীরা অনেকেই তা করে। মা-ও করেছে। তাও সে আর পারছে না অনেক দিন ধরে। এ সবই সে জানে। যদিও সবই মা বলেছে তা নয়। শুনেছে সে প্রতিবেশীদের কাছে। অবশ্য গোপন করবার চেষ্টা মা করে নি কখনো।

মা এখন যেই সে কথা তুলল অমনি মাশোয়ে ঘায়েল হয়ে গিয়েছিল তা নয় বরং ফুঁসেই উঠেছিল সে। সে মায়ের মত নয়। হয়ও নি। তার প্রথম যৌবনের প্রথম পুরুষ। তার সমস্ত মন, যৌবন নিঙড়ে দিয়ে কেনা নিজের মানুষ। মায়ের মত মেয়ে বুঝবে কি তার দাম! এই যে পথ চেয়ে থাকা, এই যে মনের মধ্যে পুড়ে পুড়ে খাক্ হাওয়া, এর যে কি ব্যথা, কি সুখ, কি বিচিত্র জ্বালা, পাঁচ হাতের কচলানো নেবুর তিক্ততায় তার স্বাদ কোথায়। কোথায় সে মিষ্টত্ব। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মাকে সে বিদায় দিতে চেয়েছিল। দিয়েও ছিল। কিন্তু একটা কথা বাজের মত আঘাত করেছিল তাকে। পুরুষ চরিত্রে অভিজ্ঞ মায়ের সেই তিক্ত উক্তি—গাংগে ভাইস্যা আইছিল, গাংগে ভাইস্যা গেছে আর আইব না। তুই পথ চাইয়া থাকলে কি হইব। সে লোক তোরে ভুইল্যা গেছে।

পুরুষের জগৎ বড়। সেখানে অনেক মেয়ে। অনেক রঙ। অনেক ঢঙ। একজনকে পেয়ে আর একজনকে ভুলে যাওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য না। হঠাৎজাগা এই ভয়টাই বড় বিদ্ধ করেছিল তাকে। সত্যি যদি সে আর না আসে। পাঁচ পাঁচটা বছর পার হয়ে গেল তবু যখন এল না, কোন্ আশায় তেজ দেখিয়ে সে ঠেকিয়ে রাখবে জেলে জোলা বাস্তার ছেলেগুলোকে। একদিন না একদিন তারা তাকে পাঁকে টেনে নামাবেই। নামতে হবেই তাকে। বিয়ে এদের কেউ তাকে করবে না। করার মুরদ তাদের নেই। তা ছাড়া তারা জানে সে স্বামী-ছাড়া। একটা বে-ওয়ারিশ মেয়েমানুষ। কেড়ে-কামড়ে ভাগযোগ করে খাওয়ার জন্যে তারা তেড়ে আসবে। শিউরে উঠেছিল মাশোয়ে।

তখনকার নিরুপায় নারকীয় জীবনের, এ চরেরই আর পাঁচটা উদাহরণ ভেসে উঠেছিল তার চোখে। সেই সঙ্গে একটা সুন্দর শান্ত মুখও ভেসে উঠেছিল। ভেসে উঠেছিল রতনলালও তার চোখের ওপরে। কানে বেজেছিল রতনলালের শাসানি।...

মায়ের বাজারে-বিকনো যৌবনের সঙ্গে মেয়ের একজনকে-বিলিয়েদেওয়া প্রেমের তুলনা করার জন্যে তাকে তখনকার মত গাল পেড়ে হটিয়ে দিলেও পরের দিন ভোর বেলাতেই মাশোয়ে অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছিল। সারা রাত অনিদ্রায় কাটিয়ে ভোর বেলা সে যখন এসে জানাল, হ্যাঁ সে রতনলালের সঙ্গে থাকতে রাজি। তখন মা বিস্মিত হয়ে তার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে ছিল। কিন্তু আর দেরি করে নি। সারারাত ভেবে-চিন্তে কেঁদে-ককিয়ে ভোর বেলা যা স্থির করেছে বিকেল বেলার মধ্যেই তা বাতিল করে দেওয়া মাশোয়ের পক্ষে অসম্ভব নয় ভেবে বাঙ্গারীতিতে দুপুরের মধ্যেই দু জনের হাত এক করে দিয়েছিল বুড়ী।

খ

মাশোয়ের চোখের জলের একটা ফোঁটা রতনলালের হাতের পিঠে পড়েছিল। সেই জলের ফোঁটাটাকে চোখের সামনে এনে দেখতে দেখতে ভাবছিল রতনলাল : মরবে তাকে না পেলে, শাসাত সে মাশোয়েকে।

অনেক মেয়ে পেয়েছিল সে জীবনে। পাকা কমলা লেবুর মত দুহাতের চাপে নিংড়ে নিঃশেষ করেছে তাদের। শৈশবে বাপ মা মরে গিয়েছিল তার। নিঃসন্তান কাকা কাকিমা মানুষ করেছে তাকে। তারা অর্থবান। রতনলালের কোন দিন অর্থের অভাব ঘটে নি। প্রয়োজনের অধিক টাকা সে পেয়েছে আর উড়িয়ে দিয়েছে মেয়েমানুষের পেছনে। কলকাতার কলেজ-জীবন থেকে যা শুরু হয়েছিল আকিয়াবের গদিতে এসেও তা চলত যদি হঠাৎ একদিন তার গলা দিয়ে রক্ত না উঠত। রক্ত দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিল রতনলাল। অসংযত জীবনের

ওপরে যবনিকা টেনে দিয়ে সে ভালমানুষ হয়ে ঘরে এসে শয্যা নিয়েছিল। কিন্তু অল্প দিনেই সে শয্যা কাঁটার মত বিঁধতে লাগল তার সারা গায়ে। মনে। সে বুঝতে পারল এ রোগ নিয়ে সভ্য সমাজে বাস করা যায় না। আত্মীয় স্বজন নাকে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে দূর থেকে তাকে দেখে যাবে মরতে, এ সহ্য হচ্ছিল না রতনলালের। তার কাকা কাকিমা ভয়ে একবার তাকে দেখতে এল না। কর্মচারীরা ফিস্‌ফিস্‌ করতে লাগল, এঁড়িয়ে যেতে লাগল। এমন যে ডাক্তার রোগী নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি যার পেশা সে পর্যন্ত ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে তার চিকিৎসা করতে আসে। এমন জায়গায় এমন সমাজে মানুষের মধ্যে সে থাকবে না, ব্যাঙ্কে যা টাকা ছিল তুলে, কাউকে কিছু না বলে একদিন রতনলাল এক শ্লুপে চড়ে বসল। সভ্য সমাজ ভদ্রলোকের জায়গা লোকালয় সব ছাড়িয়ে চলল তবু একেবারে নির্বান্ধব জায়গায় যেতে পারল না বুঝি সে। চর নিউটনে শ্লুপ ভিড়তেই নেমে পড়ল।

এখানে তাদের একটা মোকাম ছিল। সেখানে গিয়ে উঠল। ঠিক করল এই চরের জঙ্গলে একটা ডেরা বেঁধে সেখানেই সে মরণ পর্যন্ত থাকবে। চর অঞ্চলের বাগ্দী জোলার মেয়ে দু একটা পাওয়া যাবেই, তাদেরই কাউকে সঙ্গিনী করে কাটিয়ে দেবে নির্বাসনের জীবন। একটা বেহালা কিনবে কিছু বইপত্র। পড়ে বাজিয়ে কাটবে সময়। সব সময়টা তাতেও যদি না কাটে নদীর পাড়ে পাড়ে ঘুরবে। আর কিছু ভাবে নি রতনলাল। সব প্রথমের ভাবনা ছিল একটি ডেরার। সেই ডেরাটি কোথায় বাঁধবে তারই খোঁজে নিত্য বেরত সে। জমি খুঁজত, আর অলস অবসর নদীর ধারে ধারে হেঁটে বসে কাটাত।

সেদিন রতনলাল নদীর ঢালু পাড়ের বালি জমির ওপর দিয়ে হাঁটছিল। একেবারে পাড়ের প্রান্ত ধরে, যেখানে দুরন্ত ঢেউগুলি আছড়ে ভেঙে নরম পেঁজা তুলোর মত এলিয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। সেই ঢেউ বারে বারে রতনলালের পা ধুয়ে ধুয়ে যাচ্ছিল। আর বারে বারে একটা শীতল শিহরণ রোমাঞ্চিত করে তুলছিল তাকে। ভিজে বালির ওপর দিয়ে সেই শিহরণের স্বাদে মগ্ন মন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল

রতনলাল, খেয়াল করেনি, সে একটা বাঁকের সামনে এসে গেছে। এখানে ঢালু পাড়ের শেষ, খাড়া পাড়ের শুরু। শক্ত জমি, জঙ্গল। বনঝাউ শিমুল তেঁতুল মাদার তাল নারকেলের গাছে গাছে অন্ধকার। সেই অন্ধকার ছায়ায় বেড়ে উঠেছে বৈঁচি বেত চৈ-এর লতা। নানা আগাছার ঝোপঝাড়। এখান থেকে ফিরবে কি এগবে ভাবতে ভাবতে হাঁটছিল রতনলাল, কোন কিছু স্থির করবার আগেই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল সে। জঙ্গলের মধ্য দিয়েই এগচ্ছিল। শুকনো ডাল মরা পাতা তার পায়ের তলায় পড়ে খসখস মচমচ করে উঠছিল।

বুঝি সেই শব্দেই চমকে তাকিয়েছিল মাশোয়ে। একটা পাকুড় গাছের শেকড়ে বসে নদীর দিকে তাকিয়েছিল। একটা অপরিচিত এবং অভাবিত শব্দে ভীত হয়েই হয়ত অকস্মাৎ সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল সে। রতনলালের মনে হল হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে উঠল পাতাল-কন্যা। অথবা নদী থেকে উঠে এল জলপরী। বিহ্বল হয়ে পড়ল রতনলাল। সেই বিহ্বলতার মধ্যে আর কিছুই সে দেখে নি। শুধু দুটি চোখ দেখেছিল। দুটি আয়ত চোখ। মেঘনার অশান্ত বুকে উবুড় হয়ে পড়া শান্ত আকাশের মত। বোবা। বিষণ্ন। মুহূর্তের জন্যে চোখ দুটি দেখেছিল রতনলাল তারপরেই চোখ নামিয়ে নিয়েছিল এবং আর দাঁড়ায় নি, পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করেছিল। কিছু দূর এসে হঠাৎ তার আপসোস হল: চোখ দুটিকে আর একটু দেখল না কেন সে। আর একটু দাঁড়াল না কেন? তার মনে পড়ল, ওই চোখ দুটি তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়েছে, মুহূর্ত কাল তিষ্টিতে দেয় নি তার সামানে। কিন্তু এখন যেন সেই চোখই বারবার করে তাকে পেছন পানে টানছে। এগিয়ে যেতে কষ্ট হচ্ছিল রতনলালের। কষ্ট ওই চোখ দুটিতেও সে দেখেছে। ভিজে ছলছলে চোখ দুটিতে। কিন্তু কেন? কী ব্যথা ওর। কোন গভীর ব্যথা আছে কি তার মনে। একাকী। লোকালয় থেকে এত দূরে। জঙ্গলে। কেন? নদী দেখতে? চুপ করে বসে থাকতে? ভাবতে? রতনলালের কেবলি মনে হতে লাগল সর্বহারা একটি মানুষের মুক-কান্না যেন ওই চোখ দুটিতে মুখ

বুজে আছে। কিসের সে কান্না? একটি যুবতী-হৃদয়ের গোপন কথা জানবার জন্যে রতনলালের যৌবন চঞ্চল হয়ে উঠল।

সেই চঞ্চল মন নিয়ে তার পরের দিন আবার সেই জঙ্গলে নদীর ধারে এল রতনলাল। রতনলাল ভুল করে নি। সে ঠিক বুঝেছিল, ওই মেয়ে নিত্য ওখানে আসে। ওই নির্জনে নিঃশব্দে বসে সে কোন অরূপ রতনের ধ্যান করে।

রতনলাল মাশোয়েকে আর সচকিত করে নি সেদিন। তার বাড়ি ফিরে যাওয়ার অপেক্ষায় ওৎ পেতে ছিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে পেছনে পেছনে গিয়ে দূর থেকে বাড়িটিও দেখে এসেছিল। তার পরের দিন বিকেল হবার অনেক আগেই অস্থির কৌতূহলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল রতনলাল। সোজা মাশোয়ের বাড়ির দিকে রওনা হয়েছিল সে।

তেঁতুল-ছাতিমের ছায়ায় ছায়ায় বয়ে যাচ্ছে একটি সরু ঝোড়া খাল। বড় খালেরই একটি শাখা। কিন্তু গতিতে তার থেকেও সে দুরন্ত। তার ওপরে একটি বাঁশের সাঁকো পাতা। স্রোতের চাপে সে সাঁকো থরথর করে কাঁপছে। রতনলাল প্রথমে ভয় পেয়েছিল কিন্তু দুটি রহস্যময় চোখের টানে কেমন করে যেন পার হয়ে গিয়েছিল সাঁকোটি। সাঁকোর পরেই নারকেল সুপারির সারি। আম কাঁঠাল শাল শিমূলের কুঞ্জ। তার তলায় ছোট্ট একটি দীঘি। সেখান থেকে একটু এগিয়ে একটি পাতার কুঁড়ে। দীঘল ঘাসের মখমলে মোড়া চারপাশ, তার মাঝখানে লেপা-মোছা মসৃণ একটি উঠোন, উঠোনের একপাশে জাল শুকতে দেওয়া হয়েছে। আর একপাশে বাঁশের খোঁটায় বেতের তারে মাছ। মাশোয়ের পরনে লুঙ্গি আর গায়ে ব্লাউজ দেখে জেনেছিল এরা মগ। এখন জানল শুঁটকীর কারবারী। জেলে। বেবাজিয়া মগ বুঝল রতনলাল। রতনলাল জানত মগ হলেও এরা পূব বাংলারই মানুষ। পূব বাংলার জেলে জোলা বেবাজিয়াদের রক্ত এদের শরীরে। তবু মসৃণ উঠোনে দাঁড়িয়ে তার গা ছমছম করতে লাগল। কি জানি কেমন অভ্যর্থনা পাবে! বেবাজিয়াদের সম্বন্ধে নানা গল্প গুজব সে

শুনেছে। ভয়ের কথা তার মধ্যে ছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই ঘামছিল সে। এমন সময় কুঁড়ের ভেতর থেকে গলা শোনা গেল।
— দেখছেন ছোয়া, উঠানে কেডা খাড়াইয়া রইছে।

রতনলাল তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল, এখানকার আদি বাসিন্দা, আলাপ জমান যাবে।

—ফানি ফিতাম চাইছিলাম, বহুৎ তিয়াস ফাইছিল্। রতনলাল স্থানীয় ভাষায় বলে উঠল।

—কেডা ফানি চাইছে দেখ না আবাগী।

অভাগী গাল খেয়ে যে বেরিয়ে এল সে-ই ছোয়া। 'শোয়া'। আরাকান-বর্মার নাম ভেঙ্গে-চুরে ওই হয়েছে। আসলে হয় ত মাশোয়ে ওর নাম, শ্রীমতী শোয়ে। অনুমান করল রতনলাল। কী মিষ্টি নাম। কী রোমান্টিক। কিন্তু ছোয়ার—মাশোয়ের চোখে সেই বিয়োগ-বিষণ্ণতা। সেই ছলছলে দুর্বোধ্য নিস্পৃহতা। তার এক হাতে একটা মাটির ঘড়ায় জল আর এক হাতে মাটির থালায় কয়েকখানা বাতাসা।

মাশোয়ে থালা নিচে রাখবার আগেই তার হাত থেকে রতনলাল বাতাসা কখানা তুলে নিল, বাতাসা কখানা মুড়মুড় করে চিবিয়ে গিলে ফেলে যেন পিপাসায় ওষ্ঠাগত প্রাণ এমনি ব্যগ্র হাত বাড়িয়ে ঘড়াটা নিয়ে ঢক্ঢক্ করে জল খেতে লাগল। খেতে খেতেই দেখল, এক প্রৌঢ়া, অনুমান করল মাশোয়ের মা একটা বাঁশের মোড়া এনে পেতে দিয়েছে উঠোনে। জল খেয়ে রতনলাল তাতে বসল। তার পাশে মাটিতে বসল বুড়ী। বিদেশী মেহমান। তাকে খাতির করবার সাধ্য তাদের নেই। গরীব। স্বামী জেলে। মাছ ধরে। মাছ শুকোয়। কিছু বাঁশের ডালাকুলা মোড়াও বানায় তারা। চাটগাঁ আকিয়াবের দালালরা কিনে নেয়। যা পায় তাতে তাদের কষ্টের সংসার কায়ক্লেশে চলে। বুড়ীর সেই কথার সূত্র ধরেই ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা, জিনিসপত্রের দাম খাওয়া-পরার সমস্যা নিয়ে আলাপ চালিয়ে যায় রতনলাল। কিছুক্ষণ আলাপেই অনুমান করতে পারে, মাশোয়ের এই মাকে কিছু টাকা দিলেই বশ করা যাবে কিন্তু যার জন্যে সেই বিনিয়োগ

রতনলালের ধারণা সে মাটির প্রদীপ নয়। দূর আকাশের তারা। ত্বরায়ত্ত। শূন্য থালা ঘড়া নিয়ে মাশোয়ে তক্ষুনি চলে গিয়েছিল। জল খেয়ে ঘড়াটা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই। তারপর আর সে উঠোনমুখো হয় নি। হবেও না রতনলাল জানত। এতক্ষণে সে নিশ্চয় সেই জঙ্গলে, সেই পাকুড় গাছের শেকড় আঁকড়ে বসে গেছে। মোহনার গহিন তল খুঁজছে বোধ হয় দৃষ্টির দীঘল হাত বাড়িয়ে। অথবা আকাশে চেয়ে দূর দিগন্তে উড়ে যাবার কথা ভাবছে।

কি ভাবে মাশোয়ে! কি ওর চোখে। মনে। এই জগৎ জমি জীবন ফেলে সশরীরে সে কোথায় যেতে চায়। মাটির মানুষ আশেপাশের মানুষ তার চোখে পড়ে না কেন, তাকায় না কেন সে তার ডাইনে বাঁয়ে? যত ভাবে রতনলাল ততই ওই কুঁড়ের—নারকেল পাতায় ছাওয়া পাখির বাসার মত নির্জন কুঁড়ের আকর্ষণে অস্থির হয়ে ওঠে।

স্বপ্ন দেখে: কুঁড়ে। চারপাশে গাছ। গাছে গাছে বক হরিয়াল বুনো হাঁস কোকিলের ডাকাডাকি, ঝোপে ঝোপে ঘুঘু পায়রার ঘু-র্ ঘু-র্ আওয়াজ, যত্রতত্র ফিঙে চড়াই শালিকের লাফালাফি। এসবের মধ্যে থেকেও এসবের মধ্যে নয় যেন দীঘির পাড়ের গাছ্-গাছালি, ওরা যেন দীঘির কাক-চোখ জলের মধ্যে তাকিয়ে কোন স্বর্গের ছবি দেখে। কিন্তু স্বর্গ আবার কোথায়! রতনলাল স্বপ্ন দেখে, স্বর্গ এখানেই। এখানেই। ওই নির্জন শান্ত কুঁড়েকে ঘিরেই। তন্বী সুন্দরী মাশোয়ের দূরে-চাওয়া বিষণ্ণ চোখেই।

এই স্বর্গের টানে রতনলাল ছুটে আসে। এই নিত্য আসা যাওয়ার মধ্যে আজ একটু কাল একটু করে মাশোয়ের জীবন-কাহিনী শোনে রতনলাল। তার জন্মের ইতিহাসও অজানা থাকে না।

জেনে রতনলাল আবিষ্কার করল এই জায়গাটার প্রতি এত টান কেন তার—কি যাদু আছে এখানটায়।

একদিন এক যাযাবরী প্রেম তার পথের ক্লান্তি জুড়তে কিছুক্ষণের জন্যে থেমেছিল এখানে। যেমন দূর-পিয়াসী কোন পাখি

তার ওড়ার পথে মাঝদরিয়ায় কোন জাহাজের মাস্তুলে ডানা গুটিয়ে একটু জিরিয়ে নেয় তেমনি। বর্ষার ভিজে বাতাসে কেয়া ফুলের অলস গন্ধের মত সে প্রেমের মিষ্টি নিঃশ্বাসটুকু এখানকার বাতাসকে এখনো ভিজিয়ে রেখেছে। রতনলালের মনে হল, যে জায়গায় মানুষ একদিন তার চরম আনন্দ এবং পরম বেদনা ভোগ করে তা পুরনো হয়ে যাবার পরেও সে জায়গা সে আনন্দ-বেদনার এমন একটা স্মৃতির চেহারা মনে করে রাখে যা আর কোন দিনই মরে না। তার চেয়েও বেশি, সে একটা বিদেহী আত্মার স্বভাব লাভ করে। পথ চল্তি কোন লোককে নিকটে পেলে সে তার মনের ওপরে ভর করে বসে। লোকটি তখন তার মায়ায় অভিভূত হয়ে যায়।

রতনলালও অভিভূত হয়ে গিয়েছে। অভিভূত রতনলাল নিত্য আসে। মাশোয়ের মধ্যে যে বিরহী-প্রাণ তার হারানো-জনের জন্যে উন্মুখ হয়ে পথ চেয়ে আছে, সে-ই যেন টেনে নিয়ে আসে তাকে। কিন্তু মাশোয়ের ভ্রুক্ষেপহীন ব্যবহারে রাগ হতে থাকে রতনলালের। অদৃশ্য মানুষটার ওপরে ঈর্ষায় জ্বলে ওঠে সে। আবার হতাশও হয়ে পড়ে এক এক সময়। রাগের সময় ভাবে একে জোর করে নিজের করে নেবে। টাকার জোরে। টাকা দিয়ে কি এ মেয়েকে কিনতে পারবে না রতনলাল। হতাশ মুহূর্তে ভাবে ওই দেহটা শুধু নয় ওর মধ্যেকার মনটাও চায় সে। মনটাই চায়। আর একটি মনের মানুষের জন্যে অনুক্ষণ পথ চেয়ে আছে যে-মন সেই মনের মানুষ হবে সে। মন জয় করবে রতনলাল। এমনি এক অকথিত আঁকাঙ্ক্ষার দাহে পুড়ে পুড়ে রতনলাল আর এক মানুষ ভিন্ন মানুষ হয়ে উঠতে লাগল। নারী-দেহের প্রতি অন্ধ লোভ তার শান্ত হয়ে এল। ব্যাধির দুশ্চিন্তাও মুছে গেল মন থেকে। মনে হল নিজের জন্যে নিজেই যে নির্বাসনের দণ্ড নিয়েছিল বিধাতার বিচিত্র মর্জিতে তাই আজ আশীর্বাদ হয়ে তার সামনে এসেছে।

আশীর্বাদ। কথাটা মনে হয়েছিল মাশোয়ের মায়ের একদিনকার কথায়: লাল, তুমি যে এখানে নিত্য কেন আস সে আমি বুঝি।

ছোয়াকেও বুঝিয়েছি। একগুঁয়ে মেয়েটা বুঝতে চায় না। বোঝে না বুড়াবুড়ী চিরকাল বাঁচবে না। শিগগির না মরুক অথর্ব হয়ে থাকবে। সেই দুর্দিনে যে তার গতর বেচে তবে তাকে বাঁচতে হবে, বাঁচাতে হবে বাপ-মাকে সেইটে কিছুতে সমঝাতে পারি নে। তবে হ্যাঁ, আজ না বুঝুক কাল বুঝবে কিন্তু তার আগে তোমার মন বুঝে নাও লাল, একটা বেবাজিয়া মেয়ে নিয়ে চিরকাল তোমার চলবে কিনা। ওর কিন্তু সেই ভয়। তুমিও হয় ত পালাবে।

রতনলাল বলেছিল, পালানর আমার জায়গা নেই তামাম দুনিয়ার কোনখানে। আমার বলতে আমার কোথাও কেউ নেই। এখানে মরতে এসেছি। মরণ পর্যন্ত এখানকার মাটি কামড়ে পড়ে থাকব। কিন্তু সেই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মোচড় দিয়ে উঠেছিল রতনলালের বুকটা। সে ভুলেই গিয়েছিল। মাশোয়েকে প্রথম দেখার দিন থেকে আজ পর্যন্ত একটিবারও তার মনে পড়ে নি সে ব্যাধিগ্রস্ত। সে ক্ষয়-রোগী। সে আর সব পারে কিন্তু জীবনে এই প্রথম যাকে ভালবেসেছে তাকে ত ব্যাধিগ্রস্ত করতে পারে না। ভয়ে ভয়ে রতনলাল সেদিন বাড়ি ফিরেছে। দীর্ঘ দিন পরে, দীর্ঘ চার পাঁচ মাস পরে থার্মোমিটার দিয়ে সে জ্বর দেখেছে—কিন্তু কোথায় জ্বর! জ্বর নেই। ছুটে গিয়ে পাল্লায় ওজন নিয়েছে। আনন্দে অভিভূত হয়ে দেখেছে ওজন বেড়ে গেছে তার তিন চার সের। গয়ার! সারাদিন সতর্ক চোখে সে তার কফ থুথু লক্ষ্য করেছে, কিন্তু না, তাতে এক বিন্দু রক্ত নেই, পুঁজ মতন সেই থকথকে গয়ারও না। খুসখুসে সেই বিশ্রী কাশিটা পর্যন্ত নেই। গলা কুটকুট করে না, বুক ধড়ফড় করে না। ব্যথা নেই পিঠে পাঁজরায়। একা ঘরে নাচতে লাগল রতনলাল। সে ভাল হয়ে গেছে। ভীষণ সংক্রামক বলে, আর বাঁচবে না বলে যারা নাকে-মুখে কাপড় গুঁজে দূর থেকে দেখে যেত, যাদের ওপরে অভিমান করে সে এই দূর সিন্ধু-পারের জলে-জঙ্গলে নিজেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত করেছিল ইচ্ছে হল ছুটে গিয়ে তাদের প্রণাম করে আসে। তারপরে হঠাৎই সে সিদ্ধান্ত করে ফেলল, না, আর যাবে না সে সেই সভ্যজগতে।

যেখানে তার ওপরে মৃত্যুর পরোয়ানা জারি হয়েছিল, ঘৃণায় যেখানকার সকলেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, সেই বেইমান বেদরদ ভদ্র সমাজ সে চায় না। এই বেশ। এই আদিম অরণ্য, এই গহন ধুধু লোনা-জল আর বেবাজিয়ার প্রেম। যে-প্রেম মৃত্যুর পরোয়ানাকে বাতিল করে দেয়। দিতে পারে। সে-প্রেম বুকে করে অবশিষ্ট জীবন এখানেই কাটাবে রতনলাল। এখানেই।

এক প্রবল উত্তেজনায় রতনলাল মাশোয়ের হাত চেপে ধরে। আমি তোমাকে চাই মাশোয়ে, তোমাকে না পেলে আমি মরব। রতনলালের মুঠোর থেকে হাত ছাড়িয়ে নেয় মাশোয়ে। মুখ ফিরিয়ে নেয়। ছলছলে চোখ আরও ছলছলে হয়ে ওঠে। বিষণ্ণ চোখ বিষণ্ণতর হয়। কিন্তু রতনলাল হাল ছাড়ে না।

অবশেষে এক দিন হালে পানি পায় রতনলাল। মাশোয়ে তার ঘরে আসে। কিন্তু আসবার আগে মা-বাবাকে বেবাজিয়া পাড়ার এক ঘরে তুলে দিয়ে এসে নিজের কুঁড়ে ঘরটাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। যে-মানুষকে একদা সে ভালবেসেছিল তার স্মৃতি শিয়রে করে আর এক জনের হাতে নিজেকে সঁপে দিতে পারে নি সে। ভালবাসার সেই তলহীন গভীরতা আবারকরে রতনলালকে আঘাত করেছিল। ভয় পাইয়ে দিয়েছিল রতনলালকে। ওই মেয়েকে কোন দিন সে নিজের-করে পাবে কিনা সন্দেহ জেগেছিল তার মনে। তবু ধৈর্য হারায় না রতনলাল। নতুন ঘরদোর সচ্ছল সংসার সুদ্ধ নিজেকে তুলে দেয় মাশোয়ের হাতে।

নিজেরকরে পাওয়ার প্রথম দিনগুলি কামনার জোয়ারে ভেসে খুশিতে উজিয়ে গেছে রতনলাল। মনে হয়েছে তাকে কিছু দিতেই বাকি রাখে নি মাশোয়ে। মনে হয়েছে যা সে চেয়েছিল সব-ই সে নিঃশেষে পেয়েছে তার কাছ থেকে। কিন্তু প্রথম মিলনের সে উত্তেজনার ফেনায় ফেনায় উত্তাল উত্তাপ কমে আসতেই চোখে পড়ল রতনলালের, যে জায়গাকে রতনলাল মনে করেছিল গহিন গভীর অথৈ, সে জায়গার পলিমাটির তলা হাঁটু জলের নিচে নয়। মাশোয়ে তাকে

দিয়েছে, নিঃশেষে তাকে দিয়েছে ; কিন্তু দিয়েছে সেইটুকুই যা কালের ছোঁয়ায় একদিন আপনা থেকেই ঝরে যাবে। সে দিয়েছে তার দেহ, তার যৌবনের যৌতুক। কিন্তু যে আত্মার স্তিমিত জ্যোতি তার চোখের তারায় তারায় থর্থর্ করে তার নাগাল সে পায় নি। তার নাগাল থেকে দূরে ঠেকিয়ে রেখেছে সে রতনলালকে। দেহের দেউড়ি পার করে নিয়ে সে তাকে তার আত্মার আত্মীয় হতে দেয় নি। যে প্রাণ দিয়ে সে একদা একজনকৈ ভালবাসত সে প্রাণের স্পর্শ পায় নি রতনলাল। তার হৃদয়ে ঠাঁই দেয় নি মাশোয়ে তাকে। নিতান্তই মাশোয়ের বাইরের ঘরের লোক সে। জীবন ধারণের সম্বল, প্রাণ ধারণের শক্তি নয়। রতনলাল জানত তার ঐকান্তিক ভালবাসা, স্নেহ সহানুভূতি, আন্তরিকতা, তাকে সুখী করবার একান্ত চেষ্টা সব কিছুকে হেলায় দুপায়ে মাড়িয়ে যে কোন সময় চলে যেতে পারে মাশোয়ে। তাতে তার বুকে বিন্দু মাত্র বাজবে না। তার বেদনায় মাশোয়ের সহানুভূতির প্রত্যাশা নিরর্থক তা বুঝতে রতনলালের বিলম্ব ঘটে নি। হতাশায় পীড়িত রতনলাল মাশোয়ের প্রাণের বদ্ধ দুয়ারে ব্যর্থ আঘাত হেনে ফিরেছে—যে প্রাণের আসনটি জয় করবার জন্যে তার অভিযান তারই দরজার কাছে এসে নিষ্ফল প্রয়াসে মাথা খুঁড়েছে সে। মাশোয়ের হৃদয়কে সে তার নিবিড় ভালবাসার তাপে গলিয়ে নিজের ছাঁচে ঢেলে নিতে চেয়েছিল ; কিন্তু সে উত্তাপে নিরুত্তর ভ্রুক্ষেপহীন মাশোয়ে অতন্দ্র দৃষ্টি মেলে কোন্ দুর্লঙ্ঘ্য লোকের পানে চেয়ে আছে, আর কোন দিকে কারো দিকে তার চোখ নেই। মন নেই।

কখনো কখনো রতনলালের মনে হত, মাশোয়ে সত্যি হয় ত নিষ্প্রাণ। তার মধ্যে সে যে আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করছে তা মিথ্যে, সে তার উত্তপ্ত মনের কল্পনা মাত্র। খোয়াব। রতনলালের মনে মাশোয়ের মধ্যে দেহাতীত আরও কিছুর যে অনুভূতি সে তার নিজের ভালবাসার প্রতিচ্ছায়া। আর কিছু নয়। আর কিছু নেই। তার মনে হত, সে তার নিজের ভালবাসায় বন্দী হয়ে আছে। সে

ভালবাসার খাঁচা থেকে তার মুক্তি নেই। তার দুয়ার খোলা নেই কোন দিকে। যে হৃদয়াবেগ আত্মপ্রকাশের পথ পেল না তারই দুঃসহ চাপে ছটফট করছিল রতনলাল। খাঁচায় আটকা পাখির মত খাঁচার গায়ে মাথা খুঁড়ছিল। এক বিষ-জ্বালায় পুড়ছিল, জ্বলছিল তিলে তিলে। সেই জ্বালাই একদিন রক্ত হয়ে উঠে এল তার গলা দিয়ে। সেই কাল ব্যাধি আবার দেখা দিল। শয্যা নিল রতনলাল।

আজ দেড় বছর ধরে শয্যাশায়ী সে।

রতনলাল আশ্চর্য হয়ে ভাবে। বিধাতা মানুষকে দেয়। যা মানুষ চায় সবই বুঝি দেয়। কিন্তু না, যেমন করে মানুষ চায় তেমন করে দেয় না। যে সময়ে চায় সে সময়েও না। এই নিষ্ঠুর ভাগ্য-বিধাতার ওপরে প্রথম প্রথম রতনলালের বড় ক্ষোভ, বড় অভিমান হত। ক্রোধ হত। কিন্তু দিনে দিনে মন যখন শান্ত হয়ে আসতে লাগল রতনলাল বুঝল: না, বিধাতা নিষ্ঠুর হতে পারেন কিন্তু অবিবেচক নন। বরং বিধাতার মতই বিচার তাঁর, তিনি যত বড় তেমনি। ক্ষুদ্র মানুষের তা বুদ্ধির অগম্য। তাই বিধাতার বিচার দেখে মানুষ ক্ষুব্ধ হয়। বিদ্রোহ করে। আরও কত কাণ্ড করে। ধুলোবালি ছুঁড়ে দিতে চায় বিধাতার গায়ে। অনেক দূরে বসে তিনি হাসেন। পিতার মত শান্ত ক্ষমা-সুন্দর হাসি। সে হাসিই ত নিত্য ভোরে ঠিকরে পড়ে ঘাসে গাছে দীঘিতে নদীতে। সমস্ত বিশ্বে। সব উঁচু নিচু ভরে ছড়িয়ে প্রাণের বন্যা বয়ে যায়। এক স্বর্গীয় প্রাণ-বন্যা বইয়ে দেন বিধাতা। সে বন্যা রতনলালের রোগশয্যাকেও প্লাবিত করতে ছাড়ে না। একেবারে ডুবিয়ে ভাসিয়ে দেয়। বিধাতার সেই হাসি, সেই প্রাণবন্যা যাতে রতনলালের রোগশয্যা ডুবে ভেসে আছে তা অনুক্ষণ রতনলাল অনুভব করে মাশোয়ের চোখে। নিস্পৃহ নিরাসক্ত চোখে প্রাণের বন্যা নেমে এসেছে। জ্বল জ্বল করছে সে। আবেগে আগ্রহে নিবিড় স্নেহে ছলছল করছে। যে-আত্মার সান্নিধ্য পেল না বলে অনুক্ষণ মাথা খুঁড়েছে রতনলাল সেই আত্মাই এসে দাঁড়িয়েছে তার রোগশয্যার কাছে। রোগশয্যা ঘিরে। তাকে বুকের মধ্যে করে

বসেছে সে। সুস্থ অবস্থায় যার বিন্দুমাত্র স্পর্শের জন্যে সে বন্ধ দরজায় মিথ্যা মাথা খুঁড়েছে অযাচিত তারই বুক এসে তার রুগ্ন বুক ভরে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। মাশোয়ে বুঝি তার সেই পরম চাওয়াকে এই চরম দিনে বিলিয়ে দেবার জন্যেই সেদিন দরজা বন্ধ করে ছিল। মাশোয়ে দিল। দেহের প্রয়োজন যখন মিটেছে তখন আত্মার সান্নিধ্য দিল সে। কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা কাঁটা তার বুকের মধ্যে খচ্‌খচ্‌ করে। যা সে চেয়েছিল এই কি সেই? এই কী প্রেম! তবে মাশোয়ে যখন তার মাথাটা কোলে তুলে নেয় তার নিস্পৃহ চোখে সে মায়ের চোখের নরম থরথরে আলোটা দেখতে পায় কেন? মাকে বারে বারে মনে পড়ে কেন রতনলালের। আর এক বঞ্চনায় বিধাতার ওপরে ক্ষেপে ওঠে রতনলাল। তুমি দাও, সবই দাও কিন্তু মানুষ যেমন করে চায় তেমন করে দাও না।

এ ক্ষোভও একদিন ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল রতনলালের। আজ সে সন্তানের মতই মাশোয়ের স্নেহের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। কোন দ্বন্দ্ব কোন দ্বিধা আজ আর তার মধ্যে অবশিষ্ট নেই। একটা দুঃখবোধ কেবল আজকাল তাকে বড় পীড়িত করে। সেটা তার নিজের জন্যে নয়। মাশোয়ের জন্যে। তার দুরদৃষ্টের সঙ্গে রতনলাল যদি মাশোয়েকে না জড়াত, আর যাই সে করুক, এমন দেহপাত করে পরিশ্রম তাকে করতে হত না।

নিজেকে এর জন্যে অপরাধী বোধ করত রতনলাল। টাকা-কড়ি যদি তার থাকত তবুও হয় ত এত দুঃখবোধ করত না সে। আজ সে কপর্দকহীন। নিঃস্ব। যে-টাকা সে সঙ্গে করে এনেছিল তার একটা মোটা অংশ দিয়ে সে এই বাড়িঘর কিছু ধানের জমি কিনেছে অবশিষ্ট টাকার কিছু মাশোয়ের বাপমাকে দিয়েছে কিছু খরচ করেছে অনেকগুলি গল্প উপন্যাসের বই আর একটা বেহালা কিনতে। বাকি যা ছিল তুলে দিয়েছে মাশোয়ের হাতে। দিন তাদের ভালই কাটছিল। মাশোয়ে বেহালার করুণ সুর পছন্দ করত না। কিন্তু গল্প শুনতে ভালবাসত। রতনলাল পড়ত, সে শুনত। শুনে

শুনে শুধু গল্প নয় বইয়ের ভাষা পর্যন্ত আয়ত্ত করে ফেলেছে। নায়ক-নায়িকার মুখের কথাগুলিও চমৎকার করে উচ্চারণ করতে পারে সে। অদ্ভুর স্মরণ শক্তি মাশোয়ের। তা ছাড়া হয় ত ছিল রতনলালকে খুশী করবার ঐকান্তিক ইচ্ছে। যাকে সে তার হৃদয় দিতে পারল না তাকে আর সমস্ত দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছিল মাশোয়ে। কিন্তু বেশি দিন ভুলে থাকতে পারল না রতনলাল।

মাশোয়েকে বিয়ে করে রতনলাল উঠেপড়ে লেগেছিল একটি সচ্ছল সুন্দর সংসার তৈরি করবার কাজে। কিন্তু মাশোয়ের নিস্পৃহতা অমদিনেৎ তার উৎসাহকে নিবিয়ে দিয়েছিল। বিয়ের বছর খানেক পরেই লোনা জলের বান এসে রতনলালের ধানের জমি নষ্ট হয়ে যায়, সে জমির লোনা ছাড়াতে, বাঁধ দিতে রতনলাল আর চেষ্টা করে নি; কার জন্যে করবে। যার জন্যে করত সে ত এখনও পেছনের দিকে মুখ করে বসে আছে। যে-বর্ত্তমানকে নিয়ে খেয়ে পরে বাঁচতে হবে তার দিকে পর্যন্ত চোখ ফেরাচ্ছে না। সে যদি না চাইল রতনলালের চেয়ে দরকার কী। চোখ বুজে রইল রতনলাল, অবহেলায় বরবাদ হয়ে গেল জমি, অবহেলায় নিজের স্বাস্থ্যকেও বরবাদ করে দিল রতনলাল। একটা অন্তর্দ্বন্দ্বের নিরন্তর ক্লান্তিতে অসুস্থ হয়ে পড়ল সে। যখন রতনলাল বিছানা নিল চিকিৎসার জন্যে যৎসামান্য অর্থই সঞ্চিত পাওয়া গেল ঘরে।

প্রথমদিকে চাপচাপ রক্ত উঠেছিল রতনলালের। দেখে আকুল হয়ে কেঁদে উঠেছিল মাশোয়ে। দু হাতে রতনলালকে বুকের মধ্যে সাপটে ধরে বোবা পশুর মত শব্দ করত সে। বুঝে উঠতে পারত না কি করবে। কি করলে রতনলালকে বাঁচাতে পারবে। রতনলালকে শুধোয়। সে চুপ করে থাকে। হাসে। বলে, এমনি সেরে যাবে।

মাশোয়ে বিশ্বাস করে না। ছুটে যায় ডাক্তারের কাছে। যাক্। রতনলাল বাধা দেয় না। ওর জন্যে একটু ছুটোছুটি করুক, ওর কথা একটু তবু ভাবুক। নয়ত এ রোগের ডাক্তার এ বন্দরে নেই। এর

চিকিৎসাও না। সে কথা সে বলতে পারত। বলতে পারত, ডাক্তার যদিবা থাকে এ রোগের ব্যবস্থা, ওষুধ এখানে মিলবে না। আনতে হবে। লালমোহন তজুমদ্দীতে এসব ওষুধ মিলবে না। দৌলতখাঁ থেকে, হয় ত কক্সবাজার থেকে, ভোলা বরিশাল থেকেও আনানো যেতে পারে। কিন্তু খরচ অনেক। ওষুধের দামই অনেক, আনানর খরচ তারও বেশি। সে অর্থ কোথায় রতনলালের। তা ছাড়া বেঁচে থেকেইবা কী হবে। তার থেকে বরং এই বেশ। মাশোয়ের মধ্যে তার জন্যে একটা দরদ জেগেছে, চেয়ে চেয়ে এইটে দেখতেই ভাল লাগছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ওই দেখবে সে যদ্দিন বাঁচে। বেশি দিন বাঁচবে না। ততদিনও ওই দরদ থাকলে হয়। হয় ত ও-ই থাকবে না। একদিন রতনলালকে ফেলে চলে যাবে। কেন থাকবে, রোগীর সেবা করবে কষ্ট করে! প্রাণের টানত নেই, টাকার টান ছিল, সেই টাকাও নেই। লোনা জমিটা বেচলে বড় জোর ছমাস খাওয়া-পরা, চিকিৎসা চলবে। এ বাড়ি বেচলে হয়ত বছর খানেকের জন্যে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। কিন্তু তখন মাথা গুঁজবে কোথায়? তার চেয়ে, রতনলাল ভাবে, তাড়াতাড়ি মরে যাওয়াই ভাল। নিজের রোগের যন্ত্রণার মধ্যে আর একটা অনিচ্ছুক মানুষের মুখে-চোখে সব সময় একটা যন্ত্রণা দেখতে বেঁচে থাকা নরক-যন্ত্রণা ছাড়া কিছু নয়।

কিন্তু আশ্চর্য হয়ে ভাবে রতনলাল, কিসে কি হয়ে গেল। তার রোগ মাশোয়ের মন বদলে দিল একেবারে। বুকের দরজা খুলে যেন প্রাণের পিঁজরায় ভরে ফেলল তাকে, পাছে যম এসে হাত বাড়ায়, কেড়ে নিয়ে যায়। বুঝি ওইখানে হাত বাড়াতে পারে না যমও। সেই সাহসেই বুঝি বুক বেঁধেছিল মাশোয়ে। একের পর এক জমি বাগান বেচে দিচ্ছিল চোখ বুজে। রতনলাল বলেছিল—তুমি যে ভিখারী হয়ে যাবে ছোয়া, অন্তত মাথা গুঁজবার ঠাঁইটা রাখ। মাশোয়ে ধমকে উঠেছে—থামো, সে ভাবনা তোমার ভাবতে হইব না।

ভেবেই বা কি হবে। রতনলাল ভাবনা ছেড়ে দিয়েছিল। মাশোয়েকে খুশি করবার জন্যে মাশোয়ের নামে জমি-জায়গা ঘরদোর

করেছিল রতনলাল। কিন্তু রতনলাল সুখী করতে চাইলে কি হবে মাশোয়ে চায় নি সুখী হতে।

রতনলাল তাকে যেমন করে সুখী করতে চেয়েছিল তেমন করে সুখী হয় নি মাশোয়ে, হয়েছে আর এক রকম করে, নিজের মনের মতন করে। মেয়েদের মনের নিভৃতে যে সুখ পুরুষের চোখ তার সন্ধান কখনো পায় না। রতনলাল ও পায় নি। কিন্তু আজ বুঝেছে রতনলাল—মাশোয়ে তাকে পেয়ে সুখী হয়েছিল নয় ত আজকের এই দুঃখদৈন্য, রোগ সে এমন হাসি মুখে সইছে কি করে।

হাসিমুখ। ডাক্তার ডেকে এনে অবধি মুখে হাসি মাশোয়ের। ডাক্তার তাকে ভরসা দিয়েছে রতনলাল বাঁচবে। তবে অনেক টাকা খরচ। তা হোক, তবু তার লাল বাঁচবে। মাশোয়ের মুখে এখন সব সময় ভোরের কুয়াশা-ভেজা হাসি। খাটছে। রাতদিন খাটছে। একটা বুড়ী তার আর কতটা সাহায্য করে। সংসারের সমস্ত কাজ রোগীর সেবা একা হাতে চাট্টিখানি কথা নয়, তবু মুখ থেকে সেই ভোরের হাসিটি নিবে যায় না। সে যেন হাসি নয়, অপরূপ একটি প্রাণের শিখা।

সেই শিখা যে কাঁপে না কখনো, নিবুনিবু হয় না, তা নয়। হয়। তবে বড় সহজে হয় না। ভয় পেলে হয়। ডাক্তার সেই ভয় দেখিয়েছিল একদিন। প্রথম ত রতনলাল বুঝতেই পারেনি। রাত আটটা বেজে যায়, মাশোয়ে আসে না। ওষুধ আনতে গেছে সন্ধ্যায় এতক্ষণ কি করে! এত দেরি ত সে কোন দিন করে না। ছট্‌ফট্ করছিল রতনলাল। বুড়ীমাকে বারবার করে শুধোচ্ছিল। সে বেচারা বাড়িতে বসে আর কি করে ডাক্তারখানার খবর বলবে। সেও বিরক্তিতে বিড়বিড় করছিল। এমন সময় মাশোয়ে এল। হাতের শিশি বোতল টিন টেবিলে রাখতেও বুঝি সে পারছিল না এমনই কাঁপছিল সে। কোনমতে হাত খালি করে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে রতনলালের বুকে। বুকে পড়ে সে কি তার কান্না! যেন বান ডেকেছে মোহনায়, ঝড় উঠেছে ঈশান কোণে, বৃষ্টি নেমেছে আকাশ ঝেঁপে।

রতনলাল বোবা বিস্ময়ে শুধু তার মাথায়, চুলের মধ্যে হাত বুলোতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে উচ্ছ্বসিত কান্নার বেগ কিছু কমলে রতনলাল শুধোল, কি ব্যাপার, ডাক্তার বুঝি বলেছে আমি বাঁচব না?

কথা বলে না মাশোয়ে। কথা বলবে কি প্রশ্ন শুনে আবারকরে সে কাঁদতে শুরু করল। ডাক্তারের ওপরে সে দিন বড় বিরক্ত হয়েছিল রতনলাল। মরবে ত ঠিকই সে, সে ডাক্তারও জানে, রতনলালও জানে কিন্তু ওকে সে কথা বলার দরকার কী। কি বিবেচনা ডাক্তারের!

সেই কান্নার পরে আর একদিন কেঁদেছিল মাশোয়ে। তারই কিছু-দিন পরে যেদিন সে প্রথম কাজ নেয়। মহাজনের ঘরের কাজ। ডাল সুপারি ঝাড়াই বাছাইয়ের কাজ। এ কাজ বছরের শেষের দিকে বেশি থাকে। কার্তিক থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত শীতের সময়টা। এ সময়ে শুলুক সাম্পান আসে। তাতে যে সব মাল চালান যায় এখান থেকে সেগুলিই ঝাড়াই বাছাই হয় তখন দিন রাত। অনেক মেয়েছেলেই নাকি কাজ করে তখন। রতনলাল সে সব খোঁজ কোন দিন নেয় নি, রাখে না। মাশোয়ে বলল—সে সেই কাজ করবে। সব যেতে যেতে আছে ত মাত্র ভিটেটি, এটি গেলে মাথা গুঁজবার ঠাঁইটিও গেল।

দাঁতে দাঁত পিষে বলছিল মাশোয়ে। শব্দগুলো একটা কঠিন সংকল্প হয়ে বেরিয়ে আসছিল। সারাদিন সে রতনলালের কাছে থাকবে। সন্ধ্যায় যাবে ঝাড়াই বাছাইয়ের কাজে। দশটা এগারোটার বেশি রাত করবে না সে।—না কইয়ো না লাল, আমি তোমারে বাঁচামুই'বাঁচামু। এমন কইরা মরতে কিছুতে দিমু না। কান্নায় ভেজা দৃঢ় গলায় শেষ কথা কটি বলে থেমেছিল মাশোয়ে।

অনন্যোপায় রতনলাল তার কী জবাব দেবে। অক্ষমের হাতের থেকে এমনি করেই বুঝি যত্নের ধন ধুলোয় গড়িয়ে পড়ে। অক্ষম শুধু দেখে, কিছুই করতে পারে না। এখনও কিছু করতে পারল না রতনলাল, শুধু বলল—বেশ ত যেয়ো, তবে দেখো যেন বেশি খাটা-খাটুনি করে নিজেও রোগে পড়ো না। আমাকে দেখবার তুমি আছ। তোমাকে দেখবার কেউ নেই।

—আছে, খোদা। বলে সে রতনলালের কোলে মুখ গুঁজে দিয়ে কেঁদে উঠেছিল। আকুল হয়ে কেঁদেছিল অনেকক্ষণ। রতনলাল তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ভাবছিল বলে, রাত দশটা এগারোটা আমি বেশ একা থাকতে পারব, তুমি ভেব না ছোয়া। কিন্তু বলে নি পাছে স্বার্থপরের মত শোনায়।

তারপর এই আজ আবার চোখের জল ফেলল মাশোয়ে। এক ফোঁটা জল চোখ থেকে পড়তে না পড়তেই কান্না সামলে উঠে পালাল কিন্তু কান্নার এতে কি আছে বোঝে না রতনলাল। একটু বেশি রাত হয়ে গিয়েছিল, সঙ্গী পায় নি, বাড়ি ফিরতে পারে নি। এমন দেরি হলে মহাজনের গদিতে এমন অনেকেই নাকি থেকে যায়, মাশোয়ের মুখেই ত শুনেছে সে তা, আজ না হয় মাশোয়েও থেকেছে, বাধ্য হয়ে থেকেছে, তাতে এমন কান্নার কি হল। তবে হ্যাঁ, ঘুম আসছিল না, ঘুমতে পারছিল না, উঠে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেয়েছিল, এসব কথা বলা ঠিক হয় নি। তবু যেন কেন মাশোয়ের কান্নাটা ভালো লাগছিল রতনলালের। তার হাতের পিঠে মাশোয়ের চোখের জলের ফোঁটাটা সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল।

তিন

সূর্য উঠেছে অনেক উঁচোয়। বেশ বেলা হয়েছে। মোহনার জলের দিকে এখন আর চাওয়া যায় না। এপার থেকে ওপার তরল রুপোর ঝিকিমিকি শুধু। যেন লক্ষ লক্ষ রুপোর পাত আর অভ্রের কুচি ভেসে এসে জমা হয়েছে এখানে। সেগুলি ঢেউয়ে ঢেউয়ে একবার জড়ো হচ্ছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে আবার, উঠছে কাঁপছে ভাসছে থরথর করে। এই চঞ্চল তরল রুপো আর অভ্রের কুচি থেকে দপ্‌দপে আলো ঠিকরে পড়ছে চারদিকে। ছোট্ট জানালার ফুকোর দিয়ে খানিকটা এসে শুলুকে সারেঙের কেবিনেও ঢুকেছে। মোটা একটা বর্শাফলার মত বিদ্ধ হয়েছে সে এসে ঘুমন্ত সারেঙের মুখে চোখে। সে অসহ্য আঘাতে ধড়ফড়িয়ে বিছানায় উঠে বসেছে সারেঙ। চোখ রগড়ে

তাকাচ্ছে চারধারে। ফাঁকা ঘর। রাতের অন্ধকারে যে এসেছিল দিনের আলোয় তাকে পাবার কথা নয়। তবু কেমন একটা শূন্যতায় পেয়ে বসল সারেঙকে। মন খারাপ হয়ে গেল তার। কি যেন ভাবতে লাগল সে। কি মনে করতে চেষ্টা করল। হয় ত সেই মেয়েটির মুখ। মদের ঝোঁকে আবছা আলোয় যে-মুখ কয়েকবার চোখে পড়েছে তার। চোখ বেয়ে সে-মুখের ছবি মনের মধ্যে পৌঁছে সেখানে স্মৃতি হয়ে থাকবার কথা নয় সে সময়। তবু আচমকা একটা চমক দিয়ে গিয়েছিল না কি সে-মুখ। সে কি একটা, কারো সঙ্গে একটা মিল খুঁজতে চেয়েছিল না কি সেই সময়তেই। কিন্তু সে বড় অসময় ছিল মেলাবার পক্ষে। আর মেলাবেই বা কার সঙ্গে, যার সঙ্গে মেলাবে সে-মুখই কি ছাই এতদিন পরে স্পষ্ট আছে মনের মধ্যে। হাজার মুখে মুখ-মিলিয়ে মিশে গেছে। অন্তত এতদিনে একবার'ও মনে পড়ে নি। কোন দিন কোন উপলক্ষেও না। আজ মনে পড়ছে কেন? এই বন্দরে এসেছে বলে কি? মেয়েটিকে আবছা দেখেছে বলে কি? অথবা কি ভালবাসা ভোলা যায় না। ধুলো আবর্জনা জমে যতই সে মলিন হোক, মিলিয়ে থাক, মনের মধ্যেই থাকে। হঠাৎ কোথাও কিছুতে ঘষে গেলে কিংবা কোন আকস্মিকতার হাওয়ার ফুঁ লেগে, যদি সে আবর্জনা, ধুলো মালিন্য মুছে যায়, উড়ে যায়, আবার আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে ওঠে সেই ছবি। স্মৃতি। সারেঙেরও কি তাই হল। উতলা চঞ্চল হয়ে উঠল সারেঙের মন?

জানালা দিয়ে উঁকি মেরে রুপো-গলা জলের দিকে একবার তাকাল সারেঙ। গাঙচিল উড়ছে। ডাকছে। ওপর থেকে পাক খেয়ে নিচে নামছে ক্ষণেক্ষণে। ঢেউয়ের মধ্যে, ফেনায় ফেনায় খাবার খুঁজছে। তক্তাপোষ থেকে নেমে পড়ল সারেঙ। কাঠের বাক্স থেকে লুঙ্গি আর একটা তোয়ালে বার করে উঠে এল ডেকে। মহাজনদের লোকজন এসেছে। সুখানি-লস্করদের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে। মাল নামানো শুরু হয় নি এখনো। সারেঙ কারো সঙ্গে কথা বলল না। দু একজন আদাব জানাল, সেও উত্তরে নিঃশব্দে জানাল আদাব।

দঁড়ির সিঁড়ি বেয়ে সিঁড়ির নিচে বাঁধা ছোট্ট ডিঙিতে উঠল। নামল এসে পাড়ে।

দীর্ঘ দশ বছর পরে রমজানআলি চর নিউটনে ফিরে এসেছে আবার। প্রথমবার সে এসেছিল; এসেছিল ঠিক নয় তাকে নিয়ে এসেছিল বন্যা। স্রোত। সে বন্যার স্রোত তাকে মোহনা ডিঙিয়ে সাগরে নিয়ে ফেলতে পারত। কিন্তু তা করেনি। তার প্রসন্ন ভাগ্য তার গতির মোড় ফিরিয়ে তাকে এনে ঠেকিয়েছিল চর নিউটনে। তাকে একটা গাছের শেকড়ে আটকে রেখে গিয়েছিল। নয়ত ওই বন্যার ফুটন্ত মেঘনার জলে পড়ে দু চারজন ভাগ্যবান ছাড়া কেউ কোন দিন বেঁচেছে বলে জানে না রমজান। এই শেকড়ের জালে কদিন সে আটকে পড়েছিল তাও সে জানে না। জানবে কি করে, তাকে যখন একটা জেলে ডিঙি এসে তুলে নিল সে তখন অজ্ঞান। চোখ মেলেছিল নাকি দু পহর আগুনের সেঁক খেয়ে তারপর। 'জল' বলে সে নাকি চিৎকার করে উঠেছিল। তখনও চোখ খোলে নি। জলের পাত্র যখন তার মুখে ঠেকল তখন মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে সে প্রথম চোখ খুলে ছিল; আর চোখ খুলেই দেখেছিল একটি উদ্বিগ্ন কচি মুখ। মুখে আকাশ-গভীর দুটি কালো চোখের তারা। চার চোখ মিলতেই মেয়েটির সেই চোখ ভোরের তারার রোশনাই নিয়ে জ্বলে উঠেছিল।—বাজান দেখ দেখ, চউক মেলছে। চউক মেইল্যা চাইছে। চোখে মুখে গলার স্বরে নবজীবনের বার্তা রটে গেল। রমজানআলির বুকের মধ্যে পর্যন্ত। অনেকগুলি আশান্বিত মুখ ঝুঁকে পড়ল তার ওপর।

ওই স্বর শোনবার আগে পর্যন্ত রমজানআলির কানে বাজছিল মেঘনার গর্জন। ঝড়ের হাততালি। বাজ পড়ার শব্দ। অনুভূতির মধ্যে তখনও যেন বিভীষিকার মত লেপটে ছিল ক্রুদ্ধ কেউটের মত ক্রুর লক্ষ লক্ষ ঢেউয়ের হিস্‌হিস্ উল্লাস। কালোয় আর লালে লেপা বিষাক্ত-আকাশটাকে কামড়ে ছিঁড়ে মেঘনার অতলে টেনে নামানর জন্যে পাহাড়-পাহাড় সেই ঢেউগুলির কি আস্ফালন! সে কি মাথা কোটা! তারাও মাথা কুটেছিল।—খোদা রসুল বাঁচাও, পীরের দরগায়

সিন্নি দিমু, পাঁচখানা গাঁয়ের লোক খাওয়ামু। খোদা, তুমি জানে মাইর' না। কিন্তু তাঁর কানে সে কাতর কান্না পৌঁছবার আগেই টাইফুনের হিংস্র শুঁড় এসে জড়িয়ে ধরেছিল তাদের সুপারি-বোঝাই তুহাজার মণী নৌকাটাকে। সেই শুঁড়ের টানে তজুমদ্দীর বাঁকের মুখে একটা ধানের খোসার মত উলটে গিয়েছিল মোতাহার মিঞার নৌকো। রমজানের চাচা মোতাহার হালের থেকে গলা ফাটিয়ে বলেছিল—তোগ' আর বাঁচাইতে পারলাম না। রমজাইন্যা, তোরা জলে লাফাইয়া পড়্, নাইলে নায়ের তলায় চাপা পইড়া মরবি। ওরা তেরজন মাল্লা ছিল নৌকোয়। তেরজনই লাফিয়ে পড়েছিল। আকাশ-পাতাল হাঁ করেছিল জলের মধ্যে এক বিরাট দৈত্য, টাইফুন। ওরা সকলেই তার গলার গহ্বরে চলে গেল একটানে। বাঁচলে আবার দেখা হইব—বলে মোতাহার মিঞা লাফিয়ে পড়েছিল জলে। রমজানের পাশে। তার পরে আর মনে নেই রমজানের। জ্ঞান নেই।

তার দেহে উত্তাপ ছিল না। প্রাণ ছিল না। তু পহর আগুনের সেঁক পেয়ে তার দেহে যে তাপ এসেছিল, প্রাণ এসেছিল তা মাশোয়ের দেহের তাপ, মাশোয়ের প্রাণ। তু পহর বসে তিলে তিলে সে তার নিজের দেহের থেকে তাপ দিয়েছে, তার প্রাণের থেকে প্রাণ। নয় ত রমজানের মরা দেহে আর কিছুতে তাপ হত না। প্রাণ পেত না সে। মাশোয়ের বাপ-মা ত মড়া বলে ফেলেই দিতে চেয়েছিল। মাশোয়ে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল রমজানের মুখের দিকে, বাপের কথায় চমকে উঠে বুকে কান ঠেকিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল—বাপজান, ধুকপুক করতে আছে বুকটা, একটু একটু।

মাশোয়ের দেহের ছোঁয়ায় দেহ তপ্ত হয়েছিল রমজানের, প্রাণের ছোঁয়ায় জেগেছিল প্রাণ। সেই থেকে এক প্রাণ এক দেহ তু জনে। সেই যে প্রথম দৃষ্টিতে চোখ জ্বলে উঠেছিল মাশোয়ের একটি মাটির প্রদীপের শিখার মত সে সেই থেকে অনির্বাণ জ্বলেছে, নীল আকাশের তারার মত অনবরত হেসেছে। সে নিবে নি কখনো। ভোলে নি

কখনো হাসতে। [illegible] সমস্ত অতীত আড়াল করে রঙিন রোশনাইয়ের মত জ্বলেছিল। রমজানআলি পেয়েছিল প্রাণ। মাশোয়ে প্রেম। প্রাণ ও প্রেমের এই ছুটি রঙিন দীপ-শিখা এক পাতার ঘরে স্বর্গ রচনা করেছিল।

সেই স্বর্গে ছুটো বছর কি আনন্দেই না কেটেছিল তাদের। ছু জনে ডিঙি নিয়ে মাছ ধরতে বেরোত। যত না মাছ ধরত তার বেশি গান গাইত। হাসত। নৌকো ভাসিয়ে দিয়ে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াত। ছুটি মানুষের সংসার। জীবন ধারণের, দিন যাপনের গ্লানি ছিল না কিছু। এ অঞ্চলে খালে, নদীতে অঢেল মাছ। ধর। শুকাও। শুলুক সাম্পান এলে তাদের কাছে বেচ। মাছ ধরতে ইচ্ছা না যায়, ঘরে বসে হোগলা পাতার পাটি বোন, বাঁশের বেতির ডালা কুলো বানাও। তাও চলে যাবে শুলুক সাম্পানে করে আরাকানে, চট্টগ্রামে। বদলে যা নগদ আসবে এই দ্বীপের সরল জীবন তাতে স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে। হাতে হয় ত পয়সা জমবে না, কিন্তু অভাবও ঘটবে না। খাও দাও খাট। সে খাটুনিও প্রাণান্তকর নয়। বরং প্রেমের মতই হাল্‌কা, অনায়াস। বুকে বুক ঠোঁটে ঠোঁট রেখে চখাচখির মত মুখোমুখি জীবন তাই তাদের বড় সুখেই কাটছিল। আরও কাটত। ছুজন ছুজনকে বুকে করে বুক ভরে আজও এখানে থাকতে পারত। থাকত।

হিজল-ছায়ায় কালো, ডুমুর-শেওড়ায় অন্ধকার, কেয়া-ঝোপ হোগলা পাতায় ঢাকা সেই সরু ছুরন্ত খালটার ওপর দিয়ে বাঁশের সরু সাঁকো এখনো আছে। সারেঙের মনে চিড়িক মেরে উঠে, মাশোয়েও আছে তা হলে। দ্রুত পা চালিয়ে দেয় সারেঙ। আর কোন দিকে চায় না। বন-ঝাউ রেনট্রির পাতায় পাতায় দীর্ঘশ্বাস, বুনো হাঁস সারসের গলায় গলায় শোকের কান্না কানে যায় না সারেঙের। ঝোপ-জঙ্গল কাঁটা গাছ কাপড় আটকে বারণ করে। টেনে বেরিয়ে যায় সারেঙ। কিন্তু আর কোথায় যাবে, কত দূরে? দীঘি ছাড়িয়ে, শিমুল গাছটা ঘুরে, অর্জুন গাছটার গোড়ায় এসেই থমকে দাঁড়িয়েছে সারেঙ।

তারপর ভারি পা দুটো টেনে টেনে দীঘল ঘাসে ঢাকা ফণীমনসা আর বিন্নার ঝোপে ভরা পড়ো ভিতটার ওপর এসে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। পোড়া কাঠ খুঁটি এখনও দু-একটা আছে। বুনো লতায় শ্যাওলায় ঢেকেছে বটে, কিন্তু সবটুকু পোড়া চিহ্ন মিলোয় নি তার মধ্যে। নেই। মাশোয়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পোড়া ভিতের ওপর বসে পড়ল সারেঙ।

কি ভুল সে করেছিল। কি ভুল, কি ভুল। কোনদিন যায় নি। দু বছরে একটা দিন সে তার কাছ ছাড়া হয় নি। সে নিজেই যায় নি। বসে থেকে থেকে অলস হয়ে গিয়েছিল। মাশোয়েই তাকে অলস করে দিয়েছিল, কোন কাজ করতে দিত না। শেষের দিকে মাছও ধরত না। নৌকোয় বেরোত, তবে সে মাছ ধরতে নয়, বেড়াতে। জ্যোৎস্না রাত্রিতে, মাঠের মাঝ দিয়ে বয়ে-যাওয়া নিঃসঙ্গ খালটায় ভেসে পড়ত তারা, তাও বৈঠা বাইবার জন্যে একটা বাচ্চাটাচ্চা ধরে নিয়ে যেত। গান গাইত, গল্প করত, কখনো শুধু চুপচাপ আকাশ দেখত।

বাজার-হাট শুলুক ঘাটা (তখন আরফানগঞ্জের এই শুলুক ঘাটা ছিল না—মাইল পাঁচ দূরে সাহেবগঞ্জে শুলুক ভিড়ত) রমজানের কাছে ছিল বিদেশ। ইচ্ছে যেত না অতদূরে যেতে, তবু যদি বা কোন দিন আলস্য ভাঙতে যেতে চাইত, মাশোয়ের মুখে আষাঢ়ের আকাশ ঘনিয়ে উঠত। তাই দেখে রমজান হেসে এগিয়ে আসত।—চউখের ভোমরা কইর‍্যা রাখ'।

—তাইত' রাখছি। রমজানের উজ্জ্বল শ্যাম রঙ আর সুঠাম দেহটার দিকে চেয়ে থাকত মাশোয়ে। তারপর পাথরের চাঁইয়ের মত বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা জড়িয়ে ধরত।

রমজানের কোন দিন যেতে হয় নি। ওদের মালপত্র বেচা কেনা করে দিত মাশোয়ের বাপ-মা, কখনো পাড়া-প্রতিবেশী। কিন্তু সে দিন হঠাৎ হোগলাপাতার বিছানা ছেড়ে ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত টান হয়ে উঠে দাঁড়াল রমজান।—আইজ আমি যামু!

মাশোয়ের বাপ সংবাদ নিয়ে এসেছিল—কক্সবাজার থইক্যা এক বড় মহাজন আইছে শুলুক লইয়া। সুপারি মরিচ ঢের কিনৃছে, আইজ কিনব' শুঁটকী। তোগ'টা দিবি নাকি, দে, লইয়া যাই।

রমজান বলল—আইজ আমি যামু। দেইখ্যা আহি গিয়া বাজারের বাবসাব।

—হুঁউ, বাজারের বাবসাব দেখতে চলল, তুমি বাজারের বোজ'কি?

—না বুজি বাজারের বিড় দেখতে ত পারি, হেইয়াই দেখুম। আইজ যামু আমি।

—বেশ যাও, বাজানের লগ' লগ' থাইক্য, সকাল সকাল ফিরা আইয়' ।

রমজানের রোখ দেখেই হয় ত মাশোয়ে সে দিন আর বাধা দিল না। কেন বাধা দিল না মাশোয়ে। দিলে আইজ ত দুইটা দিল এমন ফারাক হইয়া যাইত না। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সারেঙ।

উঃ, কি কাণ্ডটাই না ঘটল সেদিন!

আধ মাইলটাক জায়গা নিয়ে মালে আর মানুষে যেন তিল ধারণের জায়গা নেই। পাট সুপারি লঙ্কা শুঁট্‌কী বেত-বাঁশের ঝুড়ি মোড়া ডালা কুলো এসব ত আছেই, শুলুক সাম্পানের মহাজনদের কাছে বেচবার জন্যে নিয়ে এসেছে মানুষ; তা ছাড়াও আছে। ঐ সব মাল বেচে টাকা পেয়ে গৃহস্থরা কিনবে তেল সাবান গামছা শাড়ি চুড়ি চিরুনি আয়না মুদি-মশলা খন্তা কোদাল কুড়োল লাঙলের ফলা—ঘর গৃহস্থালীর নানা দরকারী বেসাতি। সে সব বেসাতি নিয়ে আল্‌গা দোকান সব বসে গেছে এলোমেলো। তার মধ্যে পান-বিড়ি মুড়ি-মোয়া মিঠাইয়ের দোকানও আছে। আছে তেলে-ভাজার দোকান। হাঁক ডাকে খিদে পায় গলা শুকোয়। পান বিড়ি অবশ্যি চাই, চাই মুড়ি মোয়া মিঠাই। তাই সব রকমের মালে মানুষে মস্ত হাট বসেছে। দীর্ঘ দিন পরে হঠাৎ সেই হাটের ভিড়ের মধ্যে পড়ে রমজানের ভারি ভাল লাগল। ঘুরে ঘুরে সে হাট দেখতে লাগল। হাটের বেচা-কেনা হৈচৈ-চিৎকার দরদস্তুর গালাগালি-খোসামোদ হাসি-কান্না গান পান-ভোজন—একটা

গোটা জীবনের সমস্ত রং রস যেন স্তূপে স্তূপে জমে উঠেছে চার-ধারে। সেই রং রস গতির মধ্যে পড়ে রমজানের অলস রক্তেও যেন দোলা লাগল। যেন কত কাজ এমনি চঞ্চলতা এল তার মধ্যে, কনুয়ের গুঁতোয় গুঁতোয় সেই ভিড়ের মধ্যে পথকরে চলতে লাগল রমজান, মনের খুশীতে শিস্ দিয়ে বেড়াতে লাগল। কোথায় মাশোয়ের বাপ, কার কাছে কি দামে শুঁট্কী বেচছে, কি, কী করছে, সে সব দিকে খেয়াল 'নেই তার, তার সঙ্গে সঙ্গে থাকবার মাশোয়ের আদেশও সে ভুলে গেছে। সে মনের আনন্দে হাট দেখে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সেই হাটের মধ্যে সে যে আকবরআলিকে দেখতে পাবে একমাত্র খোদা ছাড়া এ বোধ হয় আর কেউ জানত না।

একটা দোকানে ফুটন্ত তেলে বড় বড় পিঁয়াজের বড়া ভাজা হচ্ছিল। একটা কলার পাতার ঠোঙায় তারই কয়েকটা আকবরআলির বাঁ হাতে। ডান হাতে সবে তার থেকে একটা তুলে কামড় দিয়েছে আকবরআলি এমন সময় কনুয়ের একটা গুঁতো খেয়ে লড়াইয়ে ষাঁড়ের মত ফুঁসে উঠল সে—হমুন্দীর পুত্, দেইখ্যা চল' না।

—হউরের পো রাস্তা ছাইড়া খাড়ইতে পার' না।

—কি কইলি! এর পরই মারমুখো দুই গোঁয়ার পরস্পরের মুখোমুখি রুখে দাঁড়াল এবং তারপর দু জনই অবাক হয়ে দু জনকে দেখতে লাগল।

—আকবইরা না!

—রমজাইন্যা না!

আকবরআলির হাত থেকে পিঁয়াজের বড়াগুলি খসে পড়ে গেল। মুখের বড়া মুখেই রইল। দু হাত বাড়িয়ে সে রমজানকে বুকের মধ্যে সাপটে ধরল। রমজানও দু হাতে জড়িয়ে ধরল আকবরআলির গলা। হাটের লোক ভাবল মারামারি। হৈচৈ পড়ে গেল চারদিকে। চারদিক থেকে কেবল চিৎকার—"মার হমুন্দিরে"—"মার হালারে"—"কইরে বউয়ার পো।" কাকে মারছে, কে মারছে, কেন মারছে কোন জিজ্ঞাসা নেই, জানবার প্রয়োজনও নেই। হাতের সওদা

দোকানে রেখে, মাথার গামছা কোমরে বেঁধে চলল মারামারি করতে। "দর দেখিছেন আমার ডালাটা," ল' দেখিছেন আমার বোজাটা, দিয়াছি দুইটা কিল"—চলল সবাই। এর নাম হাটুরে মার। মারামারির নাম শুনলেই হাত নিসপিস্ করে হাটুরেদের। কিছুর মধ্যে কিছু না, জানবার ধৈর্য পর্যন্ত না। নিসপিস্ হাত নিয়ে নিরীহ কোন গোবেচারার উপরেই, নিরপেক্ষ নির্দোষ কারো ওপরেই হয়ত হামলা চালায়। দুটো দল হয়ে যায়। কখনো এ মারামারি অনেক দূর গড়ায়, অনেক দিন গড়ায়। খুন-খারাপী পর্যন্ত হয়। কিন্তু আজ বড় হতাশ হল সবাই। মারামারি না, অনেকদিন পরে দোস্তের সঙ্গে দোস্তের মোলাকাত। 'বুকে চাইপ্যা ধরছে।' নিমেষে যে ভিড় নিরন্ধ্র হয়ে উঠেছিল নিমেষেই তা আবার ছত্রখান হয়ে গেল। বেরিয়ে এল আকবরআলি আর রমজানআলি। হাতে তাদের মস্ত দুই ঠোঙা পিঁয়াজের বড়া। হাটের থেকে অল্প দূরে একটা বট গাছের তলায় বসে দু জনে গল্প করতে করতে বড়া চিবুতে লাগল।

হাট ভাঙল, রাত হল, তবু কথার শেষ নেই। সেই যে ঝড়ের ফুটন্ত নদীতে রমজানেরা তেরজন ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল আকবরআলি ছিল তাদের একজন। তের মাল্লার একমাল্লা। রমজানের মত আকবরআলিও এক চরে গিয়ে ঠেকেছিল। জাজিরার চরে। ঝড়ের মার খেয়ে সেখানে কাত হয়েছিল এক শুলুক। সেই শুলুকের মাল্লারাই তাকে দেখে। তুলে নিয়ে বাঁচায়। সেই থেকে সে সেই শুলুকেই আছে। শুলুকে চড়ে আকিয়াব রেঙ্গুন মালয় সিঙ্গাপুর ঘুরে ঘুরে তার যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে রসিয়ে রসিয়ে তাই সে শোনাচ্ছিল রমজানকে। রমজানও শুনিয়েছে তার জান পাওয়ার কথা। মাশোয়ের কথা।

হঠাৎ আকবরআলি উঠে দাঁড়িয়ে বলল—ল' শুলুকে যাই।

রমজান দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বলল—রাইত হইয়া গেছে আইজ থাউক। হোয়া ভাবব'।

—ভাবুক। একটু ভাবতে দে। সব্ সময় মুখে-বুকে লাইগ্যা থাকলে সুখ নাই। মাঝে মাঝে ফারাক যাইতে হয়। নাইলে পিরিত জমে না। ঘন হয় না।

—নারে, আইজ না, কাইল যামু। একটু বেইল্ থাকতে আমু।

—কাইল আমরা থাকুম নাকি। আইজ রাইতেই যামু গিয়া।

আকবরআলিকে খুঁজছিল এক লস্কর। সে এসে হাজির হল তখন। —কি গো শুলুকে যাইবা না?

—হ', ল'। ল'রে রমজান।

—না দোস্ আইজ না।

—অ্যা, বাইচ্চার পিরিতে এমনই মজ্‌জস। মরণ ঘর থক্যা বাচ্যা আইলাম তবু আমার লগে একটু খানা-পিনা করবি না। ধর্ দেখিছেন কুদ্দুইস্যা চ্যাঙদোলা কইর‍্যা লইয়া যাই।

—কেডারে?

—দোস্ত। ঝড়ে বাইস্যা আইছিল। বাচ্চার পিরিতে আইটক্যা আছে। ধর্।

রমজান বাধা দিয়েছিল। প্রাণপণে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু দুজনে ধরে তাকে যদি মাটি থেকে হঠাৎ আলগা করে তোলে সে লড়বে কোথায় দাঁড়িয়ে। রমজানকে চ্যাঙদোলা করে নিয়ে যাচ্ছে দেখে একজন বাচ্চা শুঁটকীর কারবারী রমজানের চেনা লোক ছুটে এসেছিল। বাধা দিতে চেয়েছিল।

আকবরআলি তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল—মারামারি না। হাঙ্গামা ফৈজৎ কিছু না। ফুরতি কইরা চ্যাঙদোলা কইরা নিতে আছি। চিন্‌পরিচিৎ লোক। শুলুকে লইয়া যামু এক সঙ্গে খামুদামু তারপর ছাইড়া দিমু।

লোকটি আর কিছু বলে নি। নিজের কাজে চলে গেছে।

সেই যে আকবরআলি তাকে শুলুকে নিয়ে তুলল আর ছাড়ল না। শুলুক ছেড়ে দিল। সে নদীতে ঝাঁপ দেবে। মাস্তুলে মাথা ঠুকে মরবে। ভয় দেখাল। কিন্তু কিছুতে কিছু হল না। আকবর

আলির মন গলল না। রমজান মনে মনে ঠিক করল, এর পর যেখানে গিয়ে শুলুক ভিড়বে সেখান থেকে সে পালাবে। কিন্তু শুলুক আর কোথাও ভিড়ল না সোজা চলে এল আকিয়াব। আকিয়াবের জেটিতে যখন শুলুক ভিড়ল তখন সন্ধ্যা উত্তরে গেছে। রমজান ভাবল এই সুযোগে পাড়ে নেমে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দেবে। তারপর কোন একটা শুলুক বা সাম্পান ধরে চলে যাবে চর নিউটন।

কিন্তু খোদার কি মর্জি ক্ষুদ্র মানুষ কেমন করে জানবে। রমজান যখন পালানর জন্যে মনে মনে পাঁয়তারা কষছে তখন আকবর আলি তার জন্যে নিয়ে এল প্রসাধনের যাবতীয় বস্তু। সুর্মা, আতর। ইস্তিরি করা কোর্তা-কামিজ পায়জামা। ফেজ। লাল বর্ডার দেওয়া তোয়ালে। এক জোড়া স্যাণ্ডেলও। রমজান বুঝল মাটিতে নামবার আয়োজন। নিজের মতলব এ পথে সহজে হাসিল হবে বুঝে সে খুশী মনে সেজে-গুজে তৈরি হল। তারপর সকলের সঙ্গে নেমে এল পাড়ে। কিন্তু পালানর পথে পা বাড়ানর আগেই তাকে পা দিতে হল এক হোটেলে। তারা তাকে নিয়ে এল সেখানে।

এর আগে সে এমন হোটেল দেখেনি কোন দিন। ঝকঝকে আলো। মস্ত ঘর। ঘর জুড়ে একটু ফাঁক ফাঁক ছোট ছোট গোল টেবিল পাতা। তার চারধারে তিন চারটে করে চেয়ার। উর্দিপরা বয় খানসামা খদ্দেরে ঘরটা গিস্‌গিস্ করছে। গম গম করছে। ঘরের মধ্যে একটা গুমট বাতাস। বাতাসে পিঁয়াজ মাংস ডিম চা কফির পাঁচমিশেলি গন্ধ। ঝাঁঝ। মাঝে মাঝে মোটা মোটা থাম। থামে থামে বড় বড় আয়না। আয়নার ওপরে কোন কোন থামে এক একটা চোঙ বাঁধা। চোঙ থেকে গান বাজনা ঘুঙুরের শব্দ আসছে। এলাহি কারবার। চোখ বড় বড় করে দেখছিল রমজান। একপাশে আবার একসারি নীল নকসা-কাটা পর্দা ঝুলছে। উর্দি পরা খানসামাগুলো তার ভেতরে মাঝে মাঝে ঢুকছে। বেরোচ্ছে। কখনো খাবার নিয়ে ঢুকছে কখনো বোতল গেলাস নিয়ে। কখনো থালায় করে নোট খুচরো নিয়ে বেরোচ্ছে। অবাক রমজানকে টেনে এনে আকবরআলি

ঢুকে পড়ল একটা নকসা-কাটা পর্দা ঠেলে। একজন বাইরে এসে অর্ডার দিয়ে আবার ভেতরে ঢুকল।

চারধার দেখছিল রমজান। দেখবার মত কিছু নেই। ছোট্ট খুপরি। মাঝখানে রঙীন কাপড়ে ঢাকা একটা টেবিল। দু পাশে দু খানা চেয়ার। পর্দার বিপরীত দেয়ালে একটা ন্যাংটো মেয়ের ছবি। ওরা চারজন। আকবরআলি একটা চেয়ারে বসে আর একটায় পা তুলে দিল। বাকি তিন জন অন্য তিন খানায় বসল। একটু পরেই দু জন খানসামা ঢুকল। একজন টেবিলে বোতল গেলাস রাখল। আর একজন মাংস আর রুটি। বোতলটা রাখতে রাখতেই তুলে নিল আকবরআলি, দাঁত বসিয়ে ছিপিটা খুলে ফেলল। পক্ করে একটা আওয়াজ হয়ে খানিকটা চল্‌কে পড়ল টেবিলে, তার কামিজে। গন্ধটা এসে লেপটে গেল রমজানের মুখে চোখে নাকে। চোখটা একটু জ্বালা করল, নাকটা পুড়ে গেল গলা পর্যন্ত। মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। ততক্ষণে একটা গেলাসে খানিকটা ঢেলে একটু জল মিশিয়ে রমজানের সামনে ধরেছে আকবরআলি। নে খা'। শুলুক থইক্যা নাইম্যা এইটা আমাগ' পয়লা সাইদ।

নিজের গ্লাসটা হাতে তুলে নিয়ে বলল—নে উচাঁ কর। আর দুজন যথারীতি তুলে ধরেছিল। গেলাসে গেলাসে ঠোকাঠুকি করে তারা গেলাসের সবটা একবারে গলায় ঢেলে দিল। রমজান শুধু চুপ মেরে বসে রইল। দেখল।

—কিরে হালা খাবি না।

—না দোস্ত, গন্দেই প্যাট গোলাইতে আছে।

—খাইলেই সাইরা যাইব।

—মাপ কর দোস্ত। রমজান উঠে দাঁড়াল।

—কি যাইবা গিয়া ? ধর্ তরে রসিদ্দা।

রসিদ উঠল না। নড়ল না। কোন ব্যস্ততা তার মধ্যে নেই। শুধু একটা শব্দ করল। কঠিন নির্মম একটা শব্দ। রমজান বেরিয়ে যাচ্ছিল। থমকে ঘুরে দাঁড়াল।

রসিদ গেলাসটা তুলে ধরে বলল—খাও। না খাইলে বোতলের সরু গলাটা মুখের মধ্যে বইরা দিয়া তামাম বোতল প্যাটের মধ্যে ঢাইল্যা দিমু।

হাত নড়ল না। চোখ বাঁকা হল না। চোয়ালটাও শক্ত হল না একটু। অথচ কথাগুলি শুনে রমজানের শির দাঁড়া বেয়ে একটা বরফ-ঠাণ্ডা কি যেন শিরশির করে উঠল। রমজান বুঝল লোকটা তা পারে। হয়ত আরো অনেক কিছু সে পারে। লোকটাকে আর না ঘাঁটিয়ে রমজান ফিরে এসে বসল। গেলাস তুলে নিল। এবং চোখ বুজে এক ঢোক গিলল। আপনা থেকেই মুখটা বেঁকেচুরে ভেঙে কিছু একটা হল, আন্দাজ করল রমজান। কিন্তু গলার মধ্য দিয়ে সেই তরল পদার্থ যে অবধি গেল সে অবধি যে জ্বলে গেল সেইটে আর আন্দাজ নয় প্রত্যক্ষ অনুভব করল রমজান। সে টেবিলে মাথা রাখল।

—হুঁ এক ঢোকেই এই। এই হালা মাথা তোল্। হাঁ কর্। মন্ত্রমুগ্ধের মত রসিদের আদেশ আবার পালন করল সে। মাথা তুলল। হাঁ করল। এবং যে আগুন সে গলায় ঢেলে দিল তা রমজান ঢক্ ঢক্ করে গিলেও ফেলল। তারপর তার আর জ্ঞান ছিল না।

জ্ঞান যখন হল তখন চারিদিকে তাকিয়ে সে কিছুক্ষণের জন্যে অবাক হয়েছিল। চর নিউটন? মাশোয়ে? কিন্তু এত আলো? এমন বিছানা? এত বড় ঘর? কেবল এ চিন্তাটুকু তার মাথায় এসেছিল। তারপরেই এক গোছা বেলোয়ারি চুড়ির শব্দের মত রিমরিমে হাসির মধ্যে সব ডুবে গিয়েছিল। যে তরল আগুন রমজানের গলায় ঢেলে দিয়েছিল রসিদ সে-হাসির হাওয়ায় তাই সর্বাঙ্গের রক্তে ছড়িয়ে শিখা হয়ে মাথায় গিয়ে উঠছিল। রসিদ আকবরআলি কেউ কোথাও নেই। কিন্তু যে আছে সে যেন মাশোয়ের স্বপ্ন। নিরাবরণ মাশোয়েই বুঝি। না, তার থেকে অন্য রকম। মাশোয়ে আগুনের মত তপ্ত নয়। সে চাঁদের মিঠা আলো। ঠাণ্ডা। বুকে জড়ালে খুশীতে মন ছেয়ে যায়। দেহ শীতল হয়। সর্বাঙ্গ এমন ভেভে

ওঠে না। জ্বালা ধরে না বুকে। মাশোয়ে এমন বুঝি তাকায়ও না। একি চোখ, না, ক্ষুধার দাহ! একি শরীর, না, তুলোতুলো করে কাটা মাংসের কিমা! দুটো লাউয়ের ডগার মত হাত গলা জড়িয়ে ধরতে সব গোলমাল হয়ে গেল রমজানের। সব একাকার হয়ে গেল। মাশোয়ের থেকে মাশোয়ের নারীসত্তা যেন আরো সত্য আরো জ্বলন্ত হয়ে উঠল। না, মাশোয়ে পারে না এমন করে জ্বালাতে। রমজানের সর্বাঙ্গ জ্বলছিল। বুকের মধ্যে ঘন হয়ে আসা সেই মাংসের কিমার মধ্যে ডুবে গিয়ে জ্বালা জুড়োতে চাইল রমজান।

আকবরআলির এ যে একটা কুৎসিত শয়তানী রমজান বুঝেছিল। তবু নিজেকে রক্ষা করতে পারে নি। আগুনের দিকে পোকার মত সে শুধু জাহান্নামের দিকে এগিয়ে গেছে। চর নিউটনের এই শান্ত নিভৃত পরিবেশ। পলিমাটির মত তুলতুলে নরম মাশোয়ে আর তাকে টানতে পারে নি। সেই প্রথম রাত্রির তরল আগুনে এই দূর মোহনার মিঠে মাটির স্বর্গ-স্মৃতি বুঝি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে সেই আগুন নিয়ে বেপরোয়া খেলে চলেছে রমজান। মালয়ে সিঙ্গাপুরে আকিয়াবে রেঙ্গুনে কক্স বাজারে দৌলতখাঁয়, যেখানে সে গেছে সেই আগুনের খেলা নিয়ে মেতেছে সে। শুলুকে পাড়ির ক'টা দিন তার বিশ্রাম, নতুন খেলার জন্যে শরীর চাঙ্গা করা মাত্র। নয়ত ওই আগুন নিয়ে খেলাই তার জীবন। এই দশ বছর তাই সে করে আসছে। জাহান্নামের আগুনে পুড়িয়ে আসছে নিজেকে। আজ সেই পোড়ার জ্বালাই ত তার সর্বাঙ্গে, মনে। তৃপ্তি শান্তি সুখ, না, কিছুই ভাগ্যে মেলেনি তার। পায় নি সে। লস্কর থেকে সারেঙ পর্যন্ত হয়েও না। কিন্তু সারেঙ বিস্মিত হচ্ছে কাল রাতের কথা ভেবে। সেকি এক নতুন অভিজ্ঞতা নয়, নতুন অনুভব! কত দেশের কত বিচিত্র নারীই ত সে ভোগ করেছে কিন্তু এমন হৃদয়ের স্পর্শ ত কারো কাছ থেকে সে পায় নি। কি ছিল কালকের মেয়েটার মধ্যে? কি দিয়ে গেছে কালকের মেয়েটা তাকে! সারেঙ ভাবে, ব্যতিক্রমটা কোথায়! কোথায় এত জ্বালার মধ্যে কাল রাতে নরম

হাতের প্রলেপ পড়েছে। মাশোয়ের দেশের মেয়ে বুঝি বুকে বুক ঘষে তার আবর্জনা পড়া স্মৃতির আয়নাটা মুছে সাফ্ করে দিয়ে গেছে।

ঘাস বিন্না ফণীমনসার ঝোপের তলায় চাপা-পড়া ভিতের ওপরে দাঁড়িয়ে সারেঙের বুকটা মুচড়ে বেঁকে একটা ক্ষুধিত বাসনা অশ্রু হয়ে নেমে আসতে চাইছিল। গলার মধ্যে তাই গোলমতন হয়ে আটকে ছিল। বারে বারে ঢোক গিলেও তাকে নামাতে পারছিল না সারেঙ। মনে হল বড় পিপাসা পেয়েছে তার। সে ধীরে ধীরে দীঘির জলে এসে নেমে পড়ল। এই দীঘিতে সে আর মাশোয়ে—মাছের মত খেলা করেছে দু জনে, সাপের মত জড়াজড়ি করে সাঁতার কেটেছে। ডুব সাঁতার। চিৎ সাঁতার। বিগত সেই নানা রঙের দিনগুলি আজ ব্যথার স্মৃতি হয়ে ক্রমশ বড় অভিভূত করে ফেলেছিল, কাতর করে ফেলেছিল সারেঙকে। তার কঠিন কবল থেকে ছাড়া পেতেই যেন হঠাৎ হাত পা ছুঁড়ে সাঁতার কাটতে শুরু করল সারেঙ। ঢেউ তুলে জল ছিটিয়ে তোলপাড় করে তুলল দীঘির জল।

—আরে কেডারে বেকুব!

একটা নুয়ে-পড়া ডুমুর গাছের আড়ালে একটা লোক বড়শি ফেলে বসেছিল। রাগে নলখাগড়ার মত খাড়া দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল—এই লবাবের পো দেখতে আছছ্ না, বশ্যি বাইতে আছি।

হঠাৎ মানুষের গলা শুনে সারেঙ থমকে তাকাল। একটু চুপ করে থেকে বলল—অ' ছিপ ফালাইছ'। তা আমি জানুম কেমনে। ঝোপের মধ্যে ঘাপ্টি মাইরা থাকলে দেখা যায়? তা বাইজান, বাও, বশ্যি বাও। আমি উঠি।

সারেঙ উঠল। গা মাথা মুছে শুকনো লুঙ্গি পরল। তারপর আস্তে অস্তে এসে দাঁড়াল লোকটির কাছে।—দীঘিতে মাছ আছে কেমন?

লোকটা একমনে ফাত্নার দিকে তাকিয়েছিল হঠাৎ পেছনে কথা শুনে চমকে চাইল, বলল—মাছ? বহুৎ মাছ, ইয়া বড় বড়।

সারেঙ তার পাশে বসে পড়ে শুধোল—তা পাইছনি দুই একটা।

—একটা কালিবাউস।

কাছেই মাছটা পড়েছিল সারেঙ সেইটে দেখতে দেখতে বলল—বেশ বড় মাছই ত একটা মারছ'।

—ধ্যাৎ এইটা আর কি বড়, কাইল আমার হমুন্দি একটা রুইৎ মারছে এইটার তিন গুণ।

—বল কি, সাংঘাতিক।

—হ্যাঁ, এইবার লোকটা সারেঙের দিকে তাকাল, বলল, এই দীঘিটায় সাংঘাতিক সাংঘাতিক মাছই আছে, এক একটা কুমইরের লাখান। তারপরই চোখ কুঁচকে শুধোলে—তা আপনারে ত এই দিকে কোনখানে দেখছি কইরা মনে পড়ে না।

—না আমি বিদেশী। কাইল এইখানে যে বড় শুলুকটা আইছে আমি তার সারেঙ।

—সারেঙ ছাব্? তোবা তোবা আপনারে নাকি বেকুব কইছি। কসুর করছি, মাপ করবেন।

—আরে না না, কসুর ত বাইজান আমি করছি।

—কইয়েন না কইয়েন না, শুনলেও গুণাহ্ হয়। কিন্তু আপনারে এইখানে গোছল করতে পাঠাইল কোন বেকুবে। শুলুক ঘাটার কাছেই তো ঠাণ্ডা মিঠা-পানির বাহাইরা পুখইর রইছে।

আমারে কেউ পাঠায় নাই, আমি নিজেই আইছি।

সারেঙের দিকে অবাক চোখে তাকাল লোকটা। কার্তিকের এই চামড়া-পোড়া রোদ মাথায় করে চান করতে ক্রোশখানেক পথ হেঁটে আসে কেমন মানুষ।

লোকটার মনের কথা আঁচ করে সারেঙ হাসল—এই রউদ ভাইঙ্গা এদ্দূরে কেউ খামাকা আসে না বাইজান, মনের টানে আইছি।

সে আবার কেমন মনের টান! লোকটা সারেঙের দিকে তাকিয়ে চোখ কুঁচকোল।

সারেঙ এইবার তার মনের কথা বলল।

ওই যে খালি ভিটাটা ওইখানে থাকত। এক বেবাইজ্যা মাইয়া থাকত। আর.....

—তার সোয়ামীর লগে আপনের খাতির মহব্বত ছিল? সে ত' বছর দশেক আগের কথা কইতে আছেন।

—হ, হ অইব' ঐ রকমই, বছর দশ।

—আপনের সেই দোস্ত বড় জব্বর লোক। বছর দুই মাইয়াটার লগে থাইক্যা একদিন বাইগ্যা গেল'। আর আইল' না। মাইয়াটার কি কান্দন। আছাড়-পাছাড় কইরা কানৃত'। পেটে ছিল পোলা। এত কান্দলে কি আর পোলা বাঁচে। একটা মরা পোলা অইল'।

ক্রমে মাইয়াটার কান্দন থামল'। কয়দিন আর কানৃত্তে পারে মানুষ। কিন্তু পথ চাওয়ন কমল' না। দুঃখী মাইনষের মত মুখ কইরা পথের দিকে চাইয়া থাকত'। কিন্তু পথের দিকে চাইয়া থাকলেই ত' দিন কাটে না। খাওয়ন পিন্দন লাগে। বুড়া বাপ-মা আর পারতেছিল না। তবু পাঁচ পাঁচটা বছর মাইয়াটা হেই বেইমানের পথ চাইয়া রইল' তারপর বাপ মা-ই জোর জবরদস্তি কইরা আর এক বিদেশীর লগে তার নিকা দিল'।

বিটিটার আশেপাশে পোড়া কাট খুটা ছাখছেন ত'। যেদিন নিকা হইল' হেইদিন মাইয়াটা নিজের হাতে এই কুইড়াটায় আগুন লাগাইয়া দিছিল'। বেইমানটার কোন চিনাই রাখে নাই। সব আগুনে পোড়াইয়া দিছে। এখন হে আছে এই জঙ্গল ছাড়াইয়া যে বালি জমিটা তার দারে। যায়ন্ যদি চিনতে কষ্ট অইব' না। কাছেপিটে আর বাড়ি নাই, ওই একখানই। একটু জঙ্গলের মত। তার মধ্যে। উঠি অখন আইজ আর মাছে খোটাইব' না। আদাব সারেঙ ছাব্।

লোকটা ছিপ তুলে মাছ নিয়ে উঠে রওনা হল।

সারেঙও উঠে দাঁড়ল্। আদাব জানিয়ে সেও পা বাড়াল। কিন্তু পা যেন আর চলতে চাইল না। ডুমুর গাছটায় ঠেস দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সারেঙ। লোকটা জঙ্গলের পথে ঝরা-পাতা মরা-ডাল মাড়িয়ে শব্দ করে এক সময়ে মিলিয়ে গেল। তবু সারেঙের সাড়া নেই।

তাড়া নেই ফিরবার। এক একবার অনেক ভাবনা ঝড়ের ঝাপ্টার মত আছড়ে পড়ছিল এসে তার বুকে। এক একবার সে-সব এক সঙ্গে সরে যাচ্ছিল অনেক দূরে বুক শূন্য করে। আবার তক্ষুনি দল বেঁধে এসে ভেঙ্গে পড়ছিল হুড়মুড় করে। এই এলোমেলো ঝড়ো চিন্তার ক্রমাগত ঝাপ্টায় নাস্তানাবুদ সারেঙ নিজেকে সামলাতেই বুঝি দাঁড়িয়ে পড়েছিল সেখানে। নিজেকে শক্ত করতে চাইছিল। কিন্তু মনের মেঘলা আকাশ জুড়ে বিশৃঙ্খল ভাবনার যে অশ্রান্ত ঝড়ো-বাতাস বইছিল তাকে যেন আর সে ঠেকাতে পারছিল না। আঁধার-ছায়া এই বন-বাদাড়, এই কাকের চোখের মত টলটলে কালো দীঘির জল, এই নিশুতি-বিজন স্তব্ধ দুপুর, ঘাসের পোকার একটানা শব্দ, ঝিরঝিরে বাতাসে গাছের পাতার সরসর আওয়াজ, বক-বুনোহাঁসের ওয়াক্ ওয়াক্ ডাক, ফিঙে-শালিক-চড়াইয়ের অস্থির চুল-বুলোনি, পাতার আড়াল থেকে ঘুঘু হরিয়ালের ঘুম-ঘুম গলার গান—সব জড়িয়ে সব ছাড়িয়ে কার যেন একটা অশরীরী স্পর্শ সমস্ত দেহ-মন দিয়ে অনুভব করছিল সে। আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল। নিজেকে উদ্ধার করতে পারছিল না এ জায়গার যাদুকরী মোহ থেকে।

ডুমুর গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে সারেঙ ভাবছিল : যে বেহেস্ত থেকে সে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত হয়েছে সে-বেহেস্তে আর সে কোন দিন কোন অজুহাতেই ফিরে আসতে পারবে না। বেহেস্তের সেই গুলে-বকওয়ালী আজ আর হয় ত তাকে চিনতে পারবে না। চিনতেই হয় ত চাইবে না। চিনতে যদি চায় চিনতে যদি পারে তবে সে তা চাইবে, পারবে তাকে কয়েকটা কঠিন কথায় বিদ্ধ করবার জন্যেই। একদিন নিঃশব্দে কি মমতাহীন আঘাত হেনেই না সে পালিয়ে গেছে। যাওয়ার আগে একটি মিষ্টি কথাও সে বলে যায়নি। একটা মিথ্যা আশ্বাস পর্যন্ত না। মনে যদি তার এই ছিল, বলে গেলে কি সে বাধা দিত। জোর করে চলে গেলেই কি সে আটকে রাখতে পারত? তবে, এমন চোরের মত পালিয়ে গেল কেন সে? একবারও ভাবল না, যাকে

ফেলে যাচ্ছে, একা ঘরে তার কি অবস্থা হবে। সে চলে গেল রঙীন জগতের টানে হৈচৈ আনন্দের মধ্যে। নানা আকর্ষণের মধ্যে সে ভুলেই গেল অনেক অনেক দূরে মেঘনার মোহনায় একটা ছোট্ট বন্দরের এক টেরেতে অন্ধকার এক কুঁড়েঘরে তারই পথ চেয়ে পড়ে রইল একটি অসহায় মেয়ে। বর্তমান তার চোখের জলে ঝাপসা। ভবিষ্যৎ তার অনিশ্চিত। তবু দীর্ঘদিন সেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে বুক বেঁধে অপেক্ষা করেছিল। অনাহারে অনিদ্রায় বহু লোভের সঙ্গে লড়াই করে অপেক্ষা করেছিল। কিন্তু বেইমান সে এক বারের জন্যে তাকে মনেও করে নি। আজ সে যখন স্বামী সন্তান নিয়ে সুখে ঘর করছে তখন কিনা সে এসেছে পুরনো দিনের দাবি নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে।

ক্ষুব্ধ রোষে নির্মম মগ-মেয়ে না জানি কি, কাটারি নিয়েই তাড়া করে আসে। আসুক। তবু একটিবার সে তাকে দেখবে। শেষ বারের জন্যে একটি বার দেখবে। তার ছেলেমেয়েদের একটু আদর করে আসবে, তাদের কিছু মিঠাই কিনে দিয়ে আসবে।

বউ। ছেলেপুলে। ঘর। বেঁচে থাকার সুখ বলতে ত এই। সেই সুখকে হেলায় দু পায়ে মাড়িয়ে গেছে সে। হয়ে উঠেছে বে-ইখতার। বেতরিবৎ। জলে জলে ঘোরে আর মেয়েদের শরীর লুঠ করে বেড়ায়। উঃ কি ইবলিশ হয়ে উঠেছে রমজান। বেহেস্তের হুরীর পবিত্র সঙ্গ ছেড়ে গিয়েই তার এই পরিণাম। ইবলিশ রমজান আজ তার ভুখা কলিজা নিয়ে কসবীর দুয়ারে দুয়ারে মাথা খুঁড়ে মরছে। দোজখের আগুনে পুড়ে পুড়ে মারছে নিজেকে। তার ছোয়া জানুক এ কথা। তাকে দুঃখ দিয়ে সুখ পায় নি রমজান। লোনাজলে পাক খেয়ে খেয়ে মরেছে মিঠা জলের ঘাট পায় নি কোনখানে। তার কলজে জ্বলে জ্বলে খাক হয়ে গেছে। জুড়নোর জায়গা মিলেনি কোথাও। তাকে ছেড়ে গিয়ে তার এই দশা ঘটেছে, কাঁধে ভর করেছে শয়তান। এ সব কথা হয় ত আজ ছোয়া শুনতে চাইবে না। বিশ্বাস করবে না। তেড়ে মারতে আসবে। মারুক। ধারাল কাটারি দিয়ে কোপ দিক, সে বুক

পেতে নেবে। তারপরেও যদি সে বেঁচে থাকে—ফকির হয়ে চলে যাবে মক্কায়। আর ফিরবে না।

ফকির হওয়ার কথাটা হঠাৎ মনে হতেই সারেঙ মনের মধ্যে যেন একটা তৃপ্তির স্বাদ পেল। সান্ত্বনার একটা নরম ঠাণ্ডা হাত বুকের মধ্যে বুলিয়ে গেল যেন কেউ। সারেঙের মন শান্ত হল। কার্তিক-দুপুরের কাঠ-ফাটা রোদ মাথায় করে সে রওনা হল শুলুক ঘাটার দিকে। মাথায় ভিজে লুঙ্গি তোয়ালেটা পর্যন্ত জড়াল না। লাগুক মাথায় রোদ। বেহেস্তের এই রোদ মাথায় করে এখান থেকেই শুরু হোক তার তীর্থযাত্রা।

চার

মাশোয়ে কাঁদছিল। মার-খাওয়া ভীরু বেড়ালের মত রতনলালের কাছ থেকে পালিয়ে নিজের ঘরে এসে অবধি বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে কাঁদছিল মাশোয়ে। পড়ে পড়ে কাঁদছিল। শোকের বাঁধ-ভাঙা ঝড়ো বাতাস আর বেদনার বিক্ষুব্ধ ঢেউ তার বুকটাকে দুমড়ে মুচড়ে তার দেহের তীরে তীরে বারে বারে আছড়ে ভেঙে পড়ছিল। কেঁপে কেঁপে উঠছিল মাশোয়ে, আলু-থালু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল ক্ষণে ক্ষণে।

সাতাশ বছরের এইটুকুন জীবনে মাশোয়ে কেঁদেছে অনেকবার। অনেক কাঁদতে হয়েছে তাকে। প্রথম যেদিন সে কাঁদে, এমনি আলুথালু হয়ে মাথা৹ কপাল খুঁড়ে কেঁদেছিল সে। এই আসে, এই আসে করে একলা ঘরে আশঙ্কায় ভয়ে দুর্ভাবনায় সারারাত কাটিয়ে ভোরবেলা খোঁজ নিতে গিয়ে যখন জানল রমজানকে ধরে নিয়ে গেছে শুলুকের লোকেরা এবং সে রাতেই শুলুক ঘাট ছেড়ে চলে গেছে তখন মাটিতে আছড়ে পড়ে চিৎকার করে উঠেছিল মাশোয়ে। বুক-ভাঙা কান্না কেঁদেছিল। সেই কান্না দীর্ঘ অনেক দিনেও থামে নি। অনেক দিন কেঁদেছিল মাশোয়ে। তবু সেদিনের সে কান্নার মধ্যে একটা সুনিশ্চিত প্রত্যাশার আশ্বাস ছিল: আবার সে আসবে। জোর করে ধরে নিয়ে গেছে,

ছাড়া পেলেই আসবে। সে না এসে পারে না। শুধু খেলা গান আনন্দে ভরা এ সুখের জীবন ফেলে সে থাকবে কোথায়! কেমন করে থাকবে! তার ছোয়াকে ফেলে একা একা তার দিন আর রাত্রি কাটবে কি করে! দিন: কখনো পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে, কখনো হাতে হাত ধরে বনে-জঙ্গলে ছুটাছুটি করে, কখনো দীঘির কাক-কালোজল তোলপাড় করে নেয়ে, কখনো গাছের ডালে দোল্না বেঁধে কেবলি দোলা খেয়ে কি আনন্দেই না কেটে যেত সে। দিনের শেষে আর এক রকম খুশীর আস্বাদ নিয়ে আসত বিহ্বল রাত। দু জন দুজনের বুক ভরে, বুকে থেকে, সেই খুশীর আস্বাদে মজে যেত। কখন কেমন করে রাত কেটে যেত জানতেও পারত না কেউ। পুব-আকাশে সোনা-রঙ তুলি বুলিয়ে আবার আসত দিন। ঘুম জড়ান চোখে দু জনে দু জনের চোখে চোখে চেয়ে মুচকি হেসে সে সোনালী দিনকে স্বাগত জানাত। অমনি করে রাত দিনে, দিন সপ্তাহে, সপ্তাহ মাসে, মাস বছরে গড়িয়ে গেছে কিন্তু প্রথম দিনের শুভদৃষ্টির সেই রোমাঞ্চকর সুধানুভূতিটি প্রতিদিনই নতুন করে অনুভব করেছে তারা। কখনো তারা কেউ ভাবতে পারে নি, এ ভালবাসা কোনদিন শেষ হবে। এর শেষ আছে। শেষ হয়।

কোন কালেই ভালবাসায় মুগ্ধ মানুষেরা কেউ সে কথা ভাবতে পারে না। তারা এ ধারণা করেই বসে থাকে যে, তাদের ভালবাসা ভাদ্রের ভরা নদীর মত। কখনো তাতে ভাটা পড়বে না। দু কূল ডুবিয়ে রেখে অনন্তকাল তা বয়ে যাবে। এ ধারণাই ভালবাসার একমাত্র নির্ভর। আশ্রয়। এ ধারণা তারা অন্ধভাবে আঁকড়ে থাকে বলেই তারা জানতেও পারে না, তাদের অগোচরে কী পরিণাম তাদের ভাগ্যে ঘুলিয়ে উঠছে।

রমজান নিজেও জানতে পারে নি। মাশোয়েরও কোন দিন সন্দেহ হয় নি: প্রতিদিনকার একঘেয়েমির তিল তিল বিষে তাদের ভালবাসার পরমায়ু দিনদিন ক্ষীণ হয়ে আসছিল। ক্ষয় হয়ে যাচ্ছিল। তাই বৃহত্তর পৃথিবীর বিচিত্র ভোগের স্রোতে পিছলে পড়ে রমজান যখন ভেসে

গেল, আর ফিরল না, তখনও মাশোয়ে তার বিরহ-বিষণ্ণ চোখে নিশ্চিত প্রত্যাশার প্রদীপ জেলে অপেক্ষা করে বসেছিল। তাই বলছিলাম, মাশোয়ের সে দিনের সে কান্নার মধ্যে (যত বড় মর্মান্তিক কান্নাই সে হোক) বিশ্বাস ছিল। আশ্বাস ছিল। ছিল ভালবাসার জনকে বুকের মধ্যে অনুক্ষণ স্মরণ করবার দুঃসহ সুখ।

সর্বস্ব দানের এমনি এক কঠিন সুখ এবং নির্মম আনন্দ সেদিনও ছিল, যেদিন ডাক্তারের কাছ থেকে রাত করে ফিরে এসে রতনলালের বুকের ওপরে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়েছিল সে। ডাক্তারের ভিজিটের টাকা এবং ওষুধের দাম দিতে পারে নি বলে ডাক্তার তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলেছিল: তোমার টাকা নেই। কিন্তু শরীরটা আছে। ওই দিয়ে ধার শোধ কর।

মাশোয়ের মায়ের থেকে পাওয়া আরাকানী মুসলমানের রক্ত সে মুহূর্তে মাশোয়ের সারা দেহে টগবগিয়ে উঠেছিল। খুন চেপে গিয়েছিল তার মাথায়। প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে ছিনিয়ে এনেছিল মাশোয়ে। হাতের কাছে ডাক্তারেরই একটা ধারাল যন্ত্র পেয়ে, তাই তুলে সে কাল-কেউটের মত ফুঁসে উঠেছিল। ক্রূরচক্ষু মগ-মেয়ের সেই ভীষণ মূর্তি দেখে ক্ষণকালের জন্যে ঘাবড়ে গিয়েছিল ডাক্তার। কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব হারায় নি। একটু দম নিয়ে বলে উঠেছিল—আমাকে মারতে পার, তাতে রতনলাল বাঁচবে না। আমাকে খুন করলে তোমার জেল হবে, একা ঘরে রতনলাল তখন···

থমকে দাঁড়িয়েছিল মাশোয়ে। তার বুক থেকে যেন সবটুকু হাওয়া বেরিয়ে এসেছিল। চোখ বড় হয়ে গিয়েছিল। বোবা গলায় আহত পশুর মতন একটা চিৎকার করে উঠেছিল সে। ডান হাত থেকে অস্ত্রটা খসে পড়ে গিয়েছিল তার। ব্যাকুল হয়ে ডাক্তারের বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মাশোয়ে—বাঁচাও ডাক্তার, আমার সব নিয়াও তুমি ওরে বাঁচাও।

যে লোক আর কোনদিন ফিরবে না তার জন্যে তুলে-রাখা হৃদয় রতনলালকে কোনদিন দিতে পারে নি মাশোয়ে। সেই দুঃখেই ক্ষয়ে

ক্ষয়ে আজ রতনলাল শয্যাগত। এ সত্য মাশোয়ে আবিষ্কার করতে পেরেছিল যেদিন, সেদিন থেকে মাশোয়ে তার বুকের যত স্নেহ যত মমতা সব ঢেলে দিয়েছিল উজাড় করে। প্রেম দিতে না পারার প্রায়শ্চিত্ত করছিল সেবা দিয়ে। কিন্তু শুধু তাতেও যখন হল না, দেহ দিতে হল পণ্য-মূল্যে তখন সে এসে রতনলালের বুকের ওপরে পড়ে কেঁদেছিল। মর্মান্তিক কান্নাই কেঁদেছিল। কিন্তু সে কান্নার সবটা জুড়ে ছিল রতনলালকে বঞ্চিত করার জন্যে তাঁকে যে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করতে হল রতনলালকে সে কথা খুলে বলতে না পারার যন্ত্রণা এবং সে-যন্ত্রণায় নিঃশব্দে জ্বলতে থাকার আনন্দ।

আরও একদিন কেঁদেছিল মাশোয়ে। যেদিন সে পেশাকর বৃত্তি গ্রহণের সংকল্প করেছিল। শুধু ডাক্তারকে দেহ দিলে ওষুধের খরচটা চলে, ভিজিটটা মকুফ হয়। কিন্তু অন্যান্য খরচা—নিত্যকার পথ্য, সে সব আসবে কোথা থেকে। তা ছাড়া, এই ডাক্তারকে ভরসা কি! সে যদি তার দেহের লোভে রতনলালকে বিষ দিয়ে বসে। এ ডাক্তারকে আর সে ডাকবে না। ওর ওষুধ রতনলালকে খাওয়াবে না সে। ডাক্তারের প্রতি অবিশ্বাস। অন্য ডাক্তার ডাকার প্রয়োজনীয়তা। ওষুধ পথ্য ও নিত্য দরকারের খরচ যোগানর কথা ভেবে অনন্যোপায় মাশোয়ে একদিন মনে মনে যে কঠোর সংকল্প করে ফেলল তা কাজে করে তোলার দিনে রতলালের বুকে পড়ে আর একবার কেঁদেছিল সে। কেঁদেছিল মহাজনের ঘরে রাতে ঝাড়াই বাছাইয়ের কাজ নিয়েছে এই মিথ্যে বলার দুঃখে নয়; সেদিন সে কেঁদেছিল রতনলালকে তার সেবা, সঙ্গ থেকে বঞ্চিত করে তাকে রাতের বেলা একা ফেলে টাকার জন্যে দেহ ফেরি করে বেড়াতে হবে এই দুঃখে। তবু সে কান্নার মধ্যে একটা কল্যাণ ইচ্ছার দুর্বিনীত ঔদ্ধত্য ছিল, যা সহস্র দুঃখেও ভেঙে পড়ে না, কোন প্রবল আঘাতেই ধূলিসাৎ হয় না।

কিন্তু আজকের এই কান্না সে সব কান্না থেকে পৃথক। আজকের এ কান্নায় কারো স্মৃতি নিয়ে দুঃসহ সুখ নেই। নেই কারো জন্যে

সর্বস্বদানের কঠিন আনন্দ। কোন কল্যাণ ইচ্ছার দুর্বিনীত ঔদ্ধত্যও না। এ কান্না সর্বস্বান্ত মানুষের। বিলুণ্ঠিত আত্মার। প্রবঞ্চিতার। যার ফিরে আসার পথ চেয়ে তার অপেক্ষা করার দিনগুলি বুকের আগুনে জ্বলেছে। রতনলালের বুকের মধ্যে থেকেও কত রাত্রি যে-মূর্তিকে বারংবার সে স্বপ্নে দেখেছে, সেই তার স্বপ্নের-ধন চোখের জলের মানুষ আজ সশরীরে এখানে ফিরে এসেও একবার তার খোঁজ করে নি। মনে করে নি তাকে। একবার মনেও পড়েনি তার। বুকের মধ্যে পেয়েও চিনতে পারে নি। এও সম্ভব হল, সত্যি হল শেষে। ভাবতে গিয়ে মাশোয়ের বুকটা ব্যাথায় চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। সেই দুঃসহ দুঃখের মধ্যে তবু তার মনে হয়েছিল, এও ভালই হল যে, সে তাকে চিনতে পারল না। যদি সে চিনে ফেলত যদি সে বলে বসৃত—ছোয়া তুমি, তুমি পেশাকর! সেই কঠিন ধিক্কারের সামনে সে কেমন করে দাঁড়াত, কেমন করে সে তার দিকে মুখ তুলে তাকাত। তবু সেই ভাল মাশোয়ের মনের মধ্যে কোন সান্ত্বনাই বয়ে নিয়ে এল না। তার ব্যথায় ভাঙা বুকের কান্নাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না কোন মতে।

রমজানকে সে সব দিয়ে ভালবেসেছিল। উতলা যৌবন। সমস্ত হৃদয়। জীবন। বিনিময়ে রমজানেরও সব পেয়েছিল বলে বিশ্বাস করেছিল মাশোয়ে। দুজনে এক দেহ এক প্রাণ হয়ে গেছে বলে ধারণা করেছিল। রমজান তার সেই বিশ্বাস সেই ধারণার সুযোগ নিয়ে শুধু তার উতলা যৌবনটাকেই নানা ভাবে ভোগ করেছে, সেই ভোগে যেদিন তার ক্লান্তি এসেছে, সে তাকে এঁটো পাতার মত পথের ধারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেছে। একবারের জন্যেও আর ফিরে তাকায় নি। স্মরণ করেনি মুহূর্তের জন্যে। আজ ত সে তাকে একেবারে ভুলেই গেছে। অথচ সেই প্রবঞ্চনাকেই প্রেম বলে মনের মধ্যে অনুক্ষণ পুষে রেখে সেই স্মৃতির আগুনে সে তার নিঃসঙ্গ যৌবন ধূপের মত পুড়িয়ে দিচ্ছিল। এমন সময় আর এক ভালবাসার কাঙাল এল। নিজের আকুল বাসনার জোরে তাকে সেই তুঁষের আগুনের দাহ থেকে উদ্ধার করে এনে তার উদার বুকের ছায়ায় আশ্রয় দিল। কিন্তু মাশোয়ে

কি করল! প্রবঞ্চকের কুহকে আচ্ছন্ন সে, সে-প্রসারিত বুকে তুলে দিল নিরাসক্ত দেহ। নিরুৎসুক ঔদাসীন্য। নিরুত্তাপ অবহেলা। সেই বরফ কঠিন শীতলতার আঘাতে কাতর মানুষটা মর্মে মর্মে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আজ শয্যাগত। এক বে-ইখতারের বেইমানিতে সে যেমন বঞ্চিত করেছে নিজেকে, তার জীবন-যৌবন ; বঞ্চিত করেছে আর একটি শান্ত সুন্দর মানুষকেও, তার কামনা কাতর মনকে।

তবে কি আজকের এ কান্নার মধ্যে মগ-মেয়ের মনের ক্রোধ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল? না, তাও নয়। ক্রোধ হচ্ছে না আজ আর কারো ওপরে তার। আজ শুধু ব্যথা। অসীম অতল এক সমুদ্র-ব্যথা উতলা হয়ে উঠেছে তার বুকে। লোনা জলের সেই অকুল সমুদ্র আজ উদ্বেল করেছে অসহায় মেয়েটাকে। অভিযোগ নেই। নালিশ নেই। তাই তার কান্না আজ এত করুণ। এত তিক্ত। রিক্ততার হাহাকার ছোট্ট বুকখানির মধ্যে বারংবার মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে পথ খুঁজছে। দেহ কাঁপিয়ে সমস্ত শরীর অবশ করে দম আটকে দিচ্ছে মাশোয়ের। ক্রোধ। আজকের এই কান্নার মধ্যে ক্রোধ যদি থেকেও থাকে সে ক্রোধ অন্য কারো ওপরে নয়। নিজের ওপরে। আজ যার জন্যে সে নিজের দেহকে নগর-পণ্যে ফেরি করছে, তাকে সে তার ভালবাসা দিতে পারল না। এমনই দুঃখী সে। এমনই অভাগী। সে অক্ষমতার প্রায়শ্চিত্ত করতে আজ তার নারীত্ব নোংরা কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল। এ কি করল সে। এ কাতর জিজ্ঞাসাই একটা আহত সাপের মত তার বুকের লোনা জলের সমুদ্রের মধ্যে বুঝি কেবলই মাথা খুঁড়ছিল। বিষ ঢালছিল।

যাকে সে একদিন জীবন, আত্মা, যৌবন দিয়ে ভালবেসে ছিল, আর একদিন তাকে তার কাছে ফিরে আসতেই হবে, মাশোয়ের মনে সে বিশ্বাস ছিল; কিন্তু সে বিশ্বাসকে সে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারেনি বলেই আজ সে বেহেস্ত থেকে দোজখে আছড়ে পড়েছে। সত্য বটে, রমজানও আজ জাহান্নামের যাত্রী। কিন্তু সে যদি রতনলালকে বিয়ে না করত তাহলে তার সেই বিশ্বাস-নির্ভর পবিত্র জীবনই তার রমজানকে

রক্ষা করত। অন্তত সে পারত তার রমজানকে জাহান্নামের পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে। অথচ একথা মাশোয়ের একবারও মনে হল না, তেমন হলে রমজানের সঙ্গে তার আর দেখা হত না। ব্যর্থ প্রতীক্ষার জীবন বিশ্বাসে নির্ভর করে থেকে একদিন নিঃশব্দে ফুরিয়ে যেত। কিন্তু সহসা যেন কিসের এক বিষাক্ত কামড়ে অস্থির হয়ে উঠল মাশোয়ে। এ সে কি ভাবছে? রতনলালকে যদি সে বিয়ে না করত? না করলে জীবন তার একাকী এতদিন কাটত কি করে। বাঁচত কি নিয়ে। তার বুকের মধ্যে স্নেহ-মমতা-সেবার যে ইচ্ছাগুলি ক্ষুধার্ত হয়ে ছিল তারাই ত তাকে খুঁড়ে খুঁড়ে খেত। রতনলাল তার জীবনে এসেছিল তার রমণী-হৃদয়ের দখলদারী করতে, তার নারীত্বের মধ্যে বন্দী বন্ধ্যা জননী তাকে দখল করে নিয়েছে, রতনলাল নিজের অক্ষমতায় মাথা খুঁড়েছে কিন্তু তার ক্ষুধার্ত জননী-মন ধন্য হয়ে গেছে। রতনলাল তাই তার স্বামী হয়েও সন্তান। রমজান বে-ইখতার বেইমান হয়েও তার স্বামী। সর্বস্ব। একথা অস্বীকার করতে পারলে মাশোয়ে আজ নিজের বাসনার পীড়া থেকে মুক্তি পেতে পারত। হয় ত রতনলালের মধ্যেই সে তার অবশিষ্ট জীবনের তৃপ্তি খুঁজে পেত। কিন্তু তা হবার নয়। হবে না বলেই আজ এমন হাহাকার করে কাঁদছে মাশোয়ে। তার জীবনের কূল ছাপিয়ে আজ এমন লোনা জলের বান ডেকেছে।

ক

ঝড় যত প্রবল হোক সমুদ্র যত উতলা হোক এক সময়ে শান্ত হয়। কান্নাও এক সময়ে থামে। যতই শোকের, বেদনার হোক, মাশোয়ের কান্নাও এক সময়ে থামল। নিস্তেজ শরীর মন নিয়ে এলিয়ে পড়েছিল সে। ক্লান্ত দেহ-মনে একটু তন্দ্রা মতন আসতেই উঠে বসল।

বুড়ীমার বয়স হয়েছে। সব কাজ সে একা পারে না। তবু তার ওপরে রাতের সমস্ত দায়িত্বটাই সে রেখে চলে যায়। দিনের দায়িত্বটাও সে তার ঘাড়ে চাপাতে পারে। বুড়ীমা না পারলেও পারবে। করবে। কিন্তু সে অন্যায় কাজ হবে। মাশোয়ে সে অন্যায় কাজ করতে চায়

না। সে অসুস্থ হয়ে পড়লেও না। মাশোয়ে সহজে অসুস্থ হতে চায় না। তাড়াতাড়ি উঠল সে। কাল সারা রাতই হয় ত উসখুস করেছে লাল। ঘুমোয়নি। আজ তাই তার সেবা-শুশ্রূষা ওষুধ-পথ্যের প্রতি একটু বেশি নজর দিতে হবে। নয় ত তার শরীরটা খারাপ হয়ে পড়তে পারে। পোষাক-আসাক ছেড়ে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মাশোয়ে।

একটা দ্রুতলয়ের কাজ। সকালে চা রুটি তার কিছুক্ষণ পরে দুধ কলা ডিম, দুপুরে মাছ বা মাংসের ঝোল তরকারী ভাত। এ সব হয়ে গেলে সেই উনুনেই বিকেলের জলখাবারটাও অনেক দিন তৈরি করে রাখে মাশোয়ে। হেঁসেলের এই কাজগুলির বাইরে রোগীর কাপড়-চোপড় বিছানার চাদর বালিশের অড় ইত্যাদি ধোয়া-কাচা থাকে, থাকে বিছানা-বালিশ রোদে দেওয়ার কাজ, বদলে দেওয়ার কাজ। বাঁধা সময়গুলিতে ওষুধ-পথ্য দেওয়া, খেতে দেওয়া। স্নানের জল তুলে এনে, কাপড়-গামছা আগিয়ে দিয়ে, কখনো তেল মেখে, কখনো সাবান দিয়ে স্নান করিয়ে দেওয়া—মেশিনের মত কাজ। কিন্তু মাশোয়ে এসব কাজ কখনো মুখ বুজে করে না। তার কাজের ছন্দে একটা আনন্দের লয় থাকে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে রতনলালের সঙ্গে খুনসুটি করে, হাসি-মস্করা করে, আদর করে, আদর কাড়ে। মনে হয় যেন একটা পাহাড়ী পাগলা-ঝোরা পাথরের নুড়িতে নুড়িতে একটা সুরের জাল বুনছে, জল ছিটিয়ে ছড়িয়ে রামধনু উড়োচ্ছে। ছুটে চলেছে আনন্দে। রতনলাল শুয়ে শুয়ে তাই দেখে, কখনো সেই সুরে সুর মিলায় বেহালায় ছড়ি বুলিয়ে। কখনো সেই রামধনুর রঙ দেখে চোখ মেলে, চুপ করে থেকে।

কর্মব্যস্ত সকালের সময়গুলি মধ্যাহ্নে মন্থর হয়ে আসে। রতন-লালকে খাইয়ে-দাইয়ে মাশোয়ে আর বুড়ীমা খেতে বসে। রতনলাল শুয়ে পড়ে একটা বই বা পত্রিকা নিয়ে। ঘুম সহজে আসে না। খাওয়া-দাওয়া সেরে তার আগেই মাশোয়ে এসে তার কাছটিতে বসে। আজও এসে বসল। রতনলালের মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে বলল—

অনেকদিন তোমার কাছে গল্প শুনি না। একটা বই পইড়া শুনাও।
তারপরেই তাড়াতাড়ি বলে উঠল—না-না, পড়তে তোমার কষ্ট হইব'।
আস্তে আস্তে মুখেই কও। বলল—আগে আগে কি চেষ্টাটাই না
তোমার আছিল, অ আ ক খ ফলা বানান আমারে শিখাইবা। আমি
শিখতে চাই নাই। কি বেকুবি করছি। শিখলে আইজ তোমারে
পইড়া শুনাইতাম। নিজে পড়তাম। বাবা আমারে একটু একটু
শিখাইছিল। মাথাটা আমার খুব ছাফ্ আছিল। তবু চাইর
পাঁচ বছরের বিদ্যা কি ছাব্বিশ সাতাইশ বছরে মনে থাকে, না কাজে
লাগে।

মাশোয়ে চুপ করল।

রতনলালও চুপচাপ। সে ভাবছিল—সে জানে অনভ্যাসে বিদ্যা
হ্রাস পায়। কিন্তু ব্যবহার না করে, মাথাটা যে মাশোয়ের আজও সাফ্
আছে তাও সে জানে। একটা মস্ত উপন্যাস শোনার পর সে-কাহিনী
সব খুঁটিনাটি সুদ্ধ বলে যেতে পারে সে। এমন কি নায়ক-নায়িকার
ভাবনাগুলিও বাদ যায় না। বইয়ের মার্জিত চিন্তার কথাগুলিও না। কোন
কোন জায়গায় প্রায় বইয়ের ভাষায় বলে যায় মাশোয়ে। অথচ পড়তে
শিখতে চাইল না। কেন যে জেদ করল সেই জানে, তবু কি ছাড়ত
রতনলাল। সেও জেদ করত। কিন্তু হঠাৎ একদিন ছেড়ে দিল।
লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টাটাই শুধু নয় ওকে বই পড়ে শোনানর
অভ্যাসটাও। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল রতনলাল। মাশোয়ে চমকে
উঠল—কি, কি বাবতে আছ'?

—না, কিছু না। বলে মাশোয়ের কোলের মধ্যে আরও একটু ঘন
হয়ে শুল রতনলাল। ভাবতে ভাল লাগছিল। না, ঠিক ভাবতে
ভাল লাগছিল নয়, মনের মধ্যে অযাচিত জেগে উঠছিল সেই বই পড়ার
মুহূর্তে মাশোয়ের মুখের ছবিগুলি। যেদিন যে বই হোক, মিলনের
বা বিরহের, কাহিনী শুনতে শুনতে মাশোয়ের মন কোথায় চলে যেত।
রতনলাল দেখত জলো জলো বিষণ্ণ চোখে স্তিমিত দৃষ্টির দীপ এক
স্মৃতির ব্যথায় থরথর করছে।

রতনলাল ভেবেছিল, বই পড়ে প্রেম-বিরহ-মিলনের গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে মাশোয়েকে সে তার প্রতি আকৃষ্ট করবে। প্রণয়মুগ্ধ করে তুলবে। তার পরিবর্তে একদিন সে আবিষ্কার করে ফেলল বই পড়ে শোনানর বিপরীত প্রতিক্রিয়া। মাশোয়ে তার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে না। বরং ভুলে-যাওয়া ধুলোপড়া পুরনো প্রেমের স্মৃতির শুকনো ঘা'টা ধোয়া মোছা হয়ে সদ্য ব্যথার মত দগদগে হয়ে উঠেছে। অমনি বন্ধ করে দিল বই পড়া। অবশ্য তার কিছুদিন পরেই রতনলাল শয্যা নিয়েছে। যে ব্যথায় ক্ষয়ে ক্ষয়ে সে শয্যা নিয়েছিল এত দিনে সে ব্যথা সে ধুয়ে মুছে সাফ করে ফেলতে পেরেছে। মাশোয়ের শুশ্রূষাতেই তা হয়েছে। রতনলাল আজ বুঝতে পেরেছে: সে যা পেয়েছে পাচ্ছে তাই সত্য এবং সম্পূর্ণ। সে যা চাইত তা কল্পনা। সুস্থ শরীরে মাশোয়ে তাকে তার সর্বাঙ্গ দান করেছে। সে সময়ে তা-ই যথার্থ পাওনা ছিল তার। আজ অসুস্থ শরীরে মাশোয়ে তাকে দিয়েছে, দিচ্ছে, সমস্ত মন। হৃদয়। এ সময়ের জন্যে এই ত তার পরম প্রয়োজন। আর এই দুয়ে মিলে যে সমগ্র মাশোয়ে মানুষটি এ ভাবেই ত তার কাছে সম্পূর্ণরূপে ধরা দিয়ে তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। তবে আর ক্ষোভ কোথায়! যদি কোথাও থাকে সে তার অবুঝ মনে। এক-ই নারী একাধারেই সে জায়া, জননী, প্রিয়া। জায়ার সেবা জননীর স্নেহ প্রিয়ার আদর সব উৎসারিত হলেই তবে নারী ধরা দিল। ধরা পড়ল। যে পুরুষের সাহচর্যে এসে এত সব হল, সে-ই ত সে নারীর যথার্থ পুরুষ। নিজেকে সান্ত্বনা দেয় রতনলাল। সব পেয়েছে সে। কিছু আর বাকি নেই। ক্ষোভ নেই কোনখানে। ভাবতে ভাবতে রতনলাল ঘুমিয়ে পড়েছিল।

মাশোয়েও একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। গল্প শুনতে চেয়েছিল সে রতনলালের কাছে। অনেকদিন আগে একটা উপন্যাস পড়ে শুনিয়েছিল রতনলাল তাকে।—আসামের কোথায় এক সুন্দরী মেয়ে দেখে তাকে বিয়ে করে ফেলে একটা লোভী লোক। কিছুকাল পরে আগ্রায় সেই বউ নিয়ে এসে থাকার সময় আর একটি সুন্দরী মেয়ের

প্রেমে পড়ে লোকটি। প্রথম বউকে ছেড়ে চলে যায় সে। নিরুপায় বউটিকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে আর এক পুরুষ। প্রেম নিবেদন করে। তার কাঙালপনায় উদ্‌ব্যস্ত হয়ে বউটি তার প্রস্তাবে রাজী হয়। বিয়ে হয় তুজনার। কিন্তু সেই পুরুষটিকে নিয়ে বউটি সুখী হয়েছিল কি? আর একবার জানতে ইচ্ছে করছিল মাশোয়ের। পাকা লিখিয়ের লেখা বই। কিন্তু তার লালও পড়তে কম পাকা নয়। শুনতে শুনতে এক এক সময় গা শির্ শির্ করে মাশোয়ের। কান্না পায়।

তার লাল। আদর করতে গিয়েই মাশোয়ে টের পেল রতনলাল ঘুমিয়ে পড়েছে। রতনলালের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মাশোয়ে। এমন বুদ্ধি-চকচকে লোকটা ঘুমিয়ে পড়লে কেমন হাবা-বোকা দেখতে হয়। অসুখে অসুখে যেন আরও খোকা-খোকা হয়ে গেছে রতনলাল। আঁচল-ধরা শিশু। শিশুর মতই যেন এখন সে তার কোলে শুয়ে আছে মনে হতে লাগল মাশোয়ের। গভীর মমতায় ছলছলে মন নিয়ে মাশোয়ে রতনলালের চুলের মধ্যে বিলি কাটতে লাগল।

এমনি করেই তাদের তুপুর কাটে রোজ। কোন দিন মাশোয়ে পাশে শোয় রতনলালের। রতনলালকে কোলের খোকার মত আদর করে। ঘুম পাড়ায়। কোন দিন এই রকম। কোলের মধ্যে মাথা নিয়ে বসে। চুপচাপ হয়ে যায় তুজনে তুচারটে কথার পর। মাশোয়ের আঙুল রতনলালের চুলের মধ্যে চিরুনির মত চলতে থাকে। কোন দিন একটা বাঁশের মোড়া শিয়রের সামনে টেনে বসে মাশোয়ে। তখনও গল্প করতে করতে চুলের মধ্যে আঙুল চালায়। মাশোয়ের আদর-নরম ছোঁয়ায় এমনি করে রতনলাল ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে। মাশোয়ে সে ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। মাশোয়ের অন্যমনস্ক চোখেও এক সময়ে তন্দ্রা নেমে আসে। তুপুর ফুরিয়ে ফুরিয়ে বিকেল হয়।

বিকেল বেলাতেই মাশোয়ে রান্নার কাজ সেরে ফেলে। খাওয়া-দাওয়ার পাটটাও সন্ধ্যার মধ্যে সারা হয়। রাতের জন্যে রতনলালের টেবিলে সাজিয়ে রাখে ফল দুধ রুটি ছানা হালুয়া। যেদিন যেমন হয়। থাকে। একটু রাত করে রতনলাল তাই খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমনোর আগে বই পড়ে। বেহালা বাজায়।

মাশোয়ে বেরিয়ে পড়ে সন্ধ্যাতেই। যে কাপড়ে থাকে সে কাপড়েই। এসব বদলায়, মেজে-ঘসে সেজে-গুজে চেহারায় জৌলুস আনে আরফানগঞ্জে এসে। তার সহযাত্রিনী সইদের ঘরে বসে।

আশ্বিন। আশ্বিনের শেষ থেকে কার্তিক অঘ্রাণ পৌষ, ফাল্গুনেরও অনেক কয়টা দিন পর্যন্ত এই রোজনামচা ঠিক করেছিল মাশোয়ে। শীতের এই ক'টা মাসই মোহনা শান্ত থাকে। দূর দূর থেকে তখন শুলুক সাম্পান আসে। সে গুলোর মাঝি মাল্লা সারেঙ সুখানির হাতে কাঁচা পয়সা। এই কাঁচা পয়সা যদি এই মাস পাঁচেকে মোটামুটি কিছু লুটে নেওয়া যায় ফের আশ্বিন-কার্তিক আসার কাল পর্যন্ত সময়টা ঘরে বসে নিশ্চিন্তে থাকা যাবে; পরিকল্পনা করেছিল মাশোয়ে। সে পরিকল্পনায় ভুল ছিল না। কেননা ইতোমধ্যেই মাশোয়ে শ'খানেক টাকা রোজগার করেছে। এই রোজগার জমিয়ে রতনলালকে চাটগাঁ নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাবে, মাশোয়ে স্থির করেছিল মনে মনে। কিন্তু আজ মনটা তার বড় অস্থির হয়ে উঠল। রমজানের শুলুক আরফানগঞ্জে থাকাতক আর ওদিকে পা বাড়াতে পারবে না সে। কাল রাতে রমজান হয় ত তাকে চিনতে পারে নি। হয় ত প্রথম দিন বলে। মদের ঝোঁক ছিল বলে। অথবা দেখা সাক্ষাতে দশ বছরের ব্যবধান বলে। কিন্তু আর একদিন দেখলে সে ঠিক তাকে চিনে ফেলবে। সেই চিনে ফেলার মুহূর্তের কথা মনে করে মাশোয়ের সারা গা হিম হয়ে আসছিল। একটা মর্মান্তিক অনুভূতি তার মনকে ব্যাকুল করে তুলছিল।

এই ব্যাকুলতা নিয়েই মাশোয়ে বেলা থাকতে থাকতে রাঁধাবাড়া সারা করল। রতনলালকে খাওয়াল নিজেও খেল। আর এ সমস্ত কাজ কর্মের মধ্যে মন পড়ে রইল তার ভবিষ্যৎ চিন্তায়। রমজান তার প্রিয়। কিন্তু সে তার যত প্রিয়ই হোক সে অতীত। তার জীবন থেকে সে মুছে গেছে। মরে গেছে। এ মাশোয়ের অন্য জন্ম। এ জন্মে রমজানের স্থান মাশোয়ের জীবনে নেই। এ জীবনের দখলকার, দাবিদার একমাত্র রতনলাল। রতনলালকে বাঁচানর জন্যে মাশোয়ে জীবনপণ করেছে। সে-পণ সে ত মিথ্যে হয়ে যেতে দিতে পারে না। আরফানগঞ্জে যেতে না পারুক সাহেবগঞ্জে যাবে সে। টাকা চাই তার। রতনলালের ওষুধ পথ্য যোগাতে হবে। তাকে আরামে রাখতে হবে। তাকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে যেমন করে হোক।

সব কাজ তাই তাড়াতাড়ি সারা করল মাশোয়ে। আজ সে সাহেবগঞ্জ যাবে। সাহেবগঞ্জ হেঁটে যাওয়া যাবে না। একটা ডিঙি নিতে হবে। রোজগারের খানিকটা ভাগ দিতে হবে মাঝিকে। কি রোজগার হবে তাই বা কে জানে। তবু দমল না মাশোয়ে। মনের মধ্যে রমজানের জন্যে তার বাসনাকে এইভাবেই সে দুমড়ে ভেঙে দিতে চায়। দূর করে দিতে চায়। এ জীবনে রমজান তার যে আর কেউ নয় নিজেকে তাই বোঝাতে চায়। সেই তাগিদেই বেশি ব্যস্ত হয়ে সন্ধ্যার আগেই বেরিয়ে পড়বার জন্যে প্রস্তুত হল মাশোয়ে। রতনলাল বেহালা নিয়ে বসেছিল, তার চুলের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে দিয়ে বলল—সকাল সকাল যাইতে আছি। সকাল সকাল ফিরুম। তুমি কিন্তু বেশি রাইত জাইগ্যা না কাইলকার মতন।

—কাল আমি জেগে থাকিনি। আজও থাকব না। বেশি রাত হলে এসো না। থাকার যখন ব্যবস্থা আছে। অনেকেই যখন থাকে তখন বেশি রাত হলে আসার দরকার কি।

—যারা থাকে তাগ' ঘরে রোগী নাই।

—আমিও এমন মরণাপন্ন রোগী না। একরকম ধরতে গেলে আদৌ রোগী না। বেশ খাচ্ছিদাচ্ছি ঘুমোচ্ছি—রোগ কোথায়! তুমি ব্যস্ত হয়ো না।

—আমি ব্যস্ত হমু কি হমু না, তার জন্য তোমার বুদ্ধি নিমু না। তুমি মোট কথা সাবধানে থাইক্য। আমার এই কষ্ট পরিশ্রম যেন মিথ্যা হয় না। তোমারে আমি চাটগাঁ নিয়া চিকিৎসা করামু।

রতনলাল এক মুহূর্ত মাশোয়ের চোখের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ দু হাত বাড়িয়ে তাকে বুকে টেনে নিল। মাশোয়েও তার গলা জড়িয়ে ধরল। দুজনে এমনি করে চুপচাপ। এমন সময় দোর গোড়ায় কার ছায়া পড়ল। নিমেষের জন্যেই। তারপরেই সে ছায়া সরে গেল।

রতনলালের থেকে বিদায় নিয়ে রতনলালের রাতের প্রয়োজনীয়-গুলি টেবিলের ওপরে আর একবার দেখে হিসেব করে বেরিয়ে এল মাশোয়ে।

বুড়ীমা উঠোনের কোণে শুকনো পাতা এনে জড়ো করে রাখছিল। তার কাছে এসে শুধোল—তুমি আমারে কিছু কইবা বুড়ীমা?

বুড়ীমা অবাক-তাকিয়ে বলল—কই, না।

—তুমি ঘরের দুয়ার থাইক্যা ফিরা আইলা কিনা সেইজন্য জিগাইছি।

—না, আমি ত ঘরের দুয়ারে যাই নাই।

—তবে, কে গেল?

বুড়ীমা এক মিনিট দাঁতে আঙুল কামড়ে থেকে বলল—ও বুজ্জি, ওই লোকটা।

—লোকটা? কোন্ লোকটা? মাশোয়ের ভ্রূ কুঞ্চিত হল।

বুড়ীমা সদরের সামনে পাতা কুড়োচ্ছিল। এমন সময় একটা অপরিচিত লোককে বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে। কখন যে লোকটা বাড়ির মধ্যে ঢুকেছে সে দেখেনি। এখন দেখে তার মুখের দিকে মুখ তুলে তাকাল। চিনতে চেষ্টা করল। লোকটি তার সামনে এসে দাঁড়াল। বুড়ীমা চিনতে পারল না। লোকটি

জানতে চাইল সে এ বাড়ির লোক কিনা। বুড়ীমা সায় দিলে সে বলল যে, সে মাশোয়েকে চেনে। মাশোয়ের বাপ-মার সঙ্গে তার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। সে একটা শুলুকের সারেঙ। অনেক দিন পরে এখানে এসেছে। খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছে মাশোয়ের বাপ-মা নেই, আর মাশোয়ে এখানে আছে। সে দেখা করতে এসেছিল। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে গেছে বলে চলে গেল। কাল আবার আসবে।

লোকটার খবর পরিচয় দিয়ে বুড়ী বলল—ওই লোকটাই বোদহয় দাওয়ায় উঠছিল।

সে দাওয়ায় উঠেছিল! বুকটা ধড়াস করে উঠল মাশোয়ের। তা হলে ত রতনলালের বুকে তাকে দেখে গেছে সে। তার পরেও সে বলে গেছে, সে আবার আসবে। কেন আসবে? একটা অজানা ভয় নিরাকার অন্ধকারের মত ভয়ংকর হয়ে যেন অদৃশ্য ত্নই হাতে তার হৃদ্‌পিণ্ডটাকে ভীষণ চেপে ধরল। যন্ত্রণায় কাঠ হয়ে গেল মাশোয়ে।

পাঁচ

ত্নপুরবেলা কাঠফাটা রোদ মাথায় করে মনে মনে যে তীর্থযাত্রা শুরু করেছিল সারেঙ বিকেলবেলা তাই এসে শেষ হল মাশোয়ের বাড়ির দাওয়ায়।

শুলুকে পোঁছে থেকে মনটা তার কেবলই উস্‌খুস্‌ করছিল। [illegible] জন্যে হলেও মাশোয়েকে একবার সে দেখবেই এ আগ্রহে মনের মধ্যে তার অসোয়াস্তির আর অবধি ছিল না। ভেবেছিল ওই রোদ মাথায় করেই আবার বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু তা আর হল না। শুলুক থেকে মাল নামছিল তারই তদারক করতে সেই [illegible] নিয়েই তাকে বিকেল পর্যন্ত আটকে থাকতে হল। তারপরেই সে ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ল তাড়াতাড়ি। মাশোয়েকে দেখতে যাচ্ছে এই আনন্দের মধ্যেই সমস্ত পথটা মগ্ন হয়ে ছিল সারেঙ। সেই মগ্ন-আনন্দ ছাপিয়ে আর কোন চিন্তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে নি।

এইবার উঠল। মেহেদি পাতার বেড়ার ধারে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সারেঙ। ইতস্তত করতে লাগল। এইটে মাশোয়ের বাড়ি কিনা তাই নিয়ে ইতস্তত করছিল না সে। সেই দুপুর বেলা দীঘির পাড়ের লোকটা যা বলেছিল এখানে তাই দেখছে সে। অনেক দূর নিয়ে ঢালু-পাড় বালু জমি, ধারে বন-জঙ্গল মতন একটু তার মধ্যে এইত বাড়ি। আশেপাশে আর বাড়ি নেই। অতএব এই বাড়িই যে মাশোয়ের তা নিয়ে সন্দেহ ছিল না সারেঙের। মাশোয়ে তাকে চিনতে পারবে না সে সন্দেহও তখন মনে জাগে নি তার। তার সন্দেহ হচ্ছিল, সে-ই হয় ত চিনতে পারবে না মাশোয়েকে। নতুন মানুষ নিয়ে সংসার। ছেলেপুলের সংসার। এতদিনে সেই নতুন পরিবেশে সেও হয় ত একেবারে নতুন মানুষ হয়ে গেছে। কি হয়েছে সে, কেমন হয়েছে, কে জানে। হয় ত চেহারাটা পালটে গেছে অনেক। গিন্নী-গিন্নী চেহারা হয়েছে। মুখের ডৌল বদলেছে, শরীরের বাঁধন আলগা হয়েছে।

এক বাগ্দী বুড়ী যাচ্ছিল। একজন বিদেশীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শুধোল—কি চাই গো?

সারেঙ তার কাছে এগিয়ে এল—পায়রাডাঙার ওসমান বাগ্দী আমার চাচা। অনেক দিন পর আইছি। আইয়া শুনি চাচা মইরা গেছে। চাচার মাইয়া পোলা-পান লইয়া এইখানে কোন জায়গায় থাকে।

—কে, ছোয়া? এই ত' এই বাড়িত থাকে। কিন্তু 'তার ত' বাচ্চাবুচ্চা কিছু নাই। সোয়ামী আছে হেও বিছানা-লওয়া। বেটীর বরাতটা বড় মন্দ।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বুড়ী বাগ্দানী চলে গেল। সারেঙও আর অপেক্ষা করল না। চেঁচা বাঁশের বেড়াটা ঠেলে ঢুকে গেল ভেতরে। কাছেপিঠে কেউ নেই। কোন জন-মনিষ্যির সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। সারেঙ এসে উঠোনে দাঁড়াল। চারিদিকে তাকাল। কাউকেই দেখল না। অবশেষে বিছানায়-পড়া লোকটাকে

দেখতেই হয় ত উঠল গিয়ে ঘরের দাওয়ায়। ঘরের মধ্যেও পা বাড়িয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ পায়ের তলায় সাপ দেখলে মানুষ যেমন চমকে ওঠে তেমনি চমকে উঠে সারেঙ পা গুটিয়ে নিল এবং আর দাঁড়াল না। যেন পায়ের তলার সাপটা পেছন থেকে তাড়া করেছে এমনি সন্ত্রস্ত দ্রুত পায় পালিয়ে যাচ্ছিল সে। সদরের সেই ছেঁচা বাঁশের বেড়ার সামনে দেখা হয়ে গেল বুড়ীমার সঙ্গে। সারেঙ আর দাঁড়াতে পারছিল না। কোনমতে তাকে নিজের পরিচয় দিয়ে, আজ সন্ধ্যা হয়ে গেছে কাল এসে দেখা করবে বলে, যেমন চলছিল তেমনি ছুটে বেরিয়ে গেল। কিন্তু বেশি দূর তেমন ছুটতে পারল না সারেঙ। কিছুদূর এসেই পা ছুটোকে যেন বিষম ভারি মনে হতে লাগল তার। মনে হল, পায়ের তলাকার সেই সাপটাই ছোবল মেরে দিয়েছে তার পায়ে। পা ছুটো তাই বিষে অবশ হয়ে আসছে। তারা যেন আর বইতে পারছে না তাকে। সেই অবশ ভারি পা ছুটো টেনে টেনে চলতে লাগল সারেঙ। বিষে জ্বলতে জ্বলতে চলল। কিন্তু হঠাৎ মনে হল এ জ্বালা ত বিষের নয়। পোড়ার।

এক নিমেষের দেখা। কিন্তু সেই এক নিমেষের আঁচেই বুঝি সারেঙের কলজেটা পুড়ে ফোস্‌কা পড়ে গেছে। জ্বালাপোড়া করছে। সমস্ত শরীর ব্যথায় কুঁকড়ে যাচ্ছে। তবু প্রাণপণে সারেঙ নিজেকে সান্ত্বনা দিতে লাগল, শান্ত করতে লাগল। চাঙ্গা করে তুলতে লাগল নিজেকে।

: এ দোষ ত মাশোয়ের নয়। তারই। সেই ত তাকে কিছু না বলে নিঃশব্দে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এবং গিয়ে অবধি আর তার খোঁজ খবর করে নি। সে বেঁচে আছে কি মরেছে, কি হালে কেমন করে তার দিন যাচ্ছে কোন কথাই ভাবে নি। নতুন ছনিয়ায় ছুশমনদের ভিড়ে মাশোয়েকে ভুলেই গিয়েছিল। আজ অন্য পুরুষের বুকের মধ্যে তাকে দেখে ঈর্ষায় জ্বলে কোন লাভ নেই। আজ আর কোন দাবি নেই মাশোয়ের ওপরে তার। তাদের ভালবাসার মধ্যে এমন কোন শর্ত ছিল না যে, সে মাশোয়েকে ছেড়ে

গেলেও এবং দীর্ঘ কালের মধ্যে ফিরে না এলেও মাশোয়ে তার পথ চেয়ে শূন্য ভিটে কামড়ে পড়ে থাকবে। তবু মাশোয়ে ছিল, পাঁচ পাঁচটা বছরই নাকি ছিল। আর সে নিজে? কক্সবাজারে পৌঁছে রাতটা পোহাতে পারে নি। রাতের মধ্যেই সে মদ খেতে শিখেছে। পেরেছে অনায়াসে অন্য মেয়ের বুকের ওপরে ঘুমোতে।

শিথিল পায়ে হাঁটছিল সারেঙ। আর ভাবছিল। হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে ভাবল সারেঙ। ছোয়াকে চিনতে ত তার এক মুহূর্তও লাগল না। সে-ই আছে। তেমনি। কলাগাছের মাজ-পাতার মত। সে-ই রকম দীঘল কচি। একহারা। কোঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলি তেমনি কাঁধের ওপরে লুটনো। চুলে ঢাকা আধখানা গালের ডৌলটি ভাঁজটিও সেই তেমনি। দীঘির জলের ঢেউয়ের মত। আঁকাবাঁকা। নরম নরম। সারেঙ অবাক হয়ে যায়। দীর্ঘ আট বছর পরে দেখল। একটি মুহূর্তের জন্যে দেখল। তবু সেই এক মুহূর্তে চিনে ফেলল সে তার ছোয়াকে। একটু সন্দেহ ছায়া ফেলল না মনে। একটু খট্‌কা লাগল না। মনে হল যেন নিত্য দেখে সে এই মুখ। কালও দেখেছে। কাল? সারেঙের কপাল কুঁচকে গেল। তারপরেই মাথা ঝাঁকিয়ে উঠল সে। কালি-মারা লণ্ঠনের হলদে আলোয় মদ খাওয়া লাল চোখের ঘোলা দৃষ্টিতে অনেক পেত্নীকেই পরী মনে হয়। অনেক অচেনাকে চেনা। আসলে মাশোয়ের গায়ের রঙ মাখা চর নিউটনের দিন, তার চোখের তারার কালিতে মাখা চর নিউটনের রাত, তার গায়ের গন্ধ মাখা চর নিউটনের বাতাস, তার মনের মত রহস্যময় চর নিউটনের আকাশ। সেই মনের মতই অতল চর নিউটনের মোহনা মনে করিয়ে দিয়েছে তার ছোয়াকে। ভুলে-যাওয়া সময়ের অবহেলায় মনের মধ্যে জমে-ওঠা ধুলো ময়লা ঝেড়ে মুছে সাফ করে ছোয়ার ছবিকে চোখের সামনে তুলে এনে ধরেছে চর নিউটন। তাই তাকে চিনতে তার দীর্ঘ আট বছর পরেও এক মুহূর্ত দেরি লাগে নি। অনেকক্ষণ থেকেই বাসনার একটা ঝিরঝিরে ধারা ধীরে ধীরে জমে উঠছিল সারেঙের মনে। সেই ধারা

জমে জমে এখন থৈ থৈ করতে লাগল। আর সারেঙ তার পোড়া কলজে জুড়োবার জন্যে সেই বাসনার দহে ডুব দিল। সাঁতার কাটতে লাগল।

মাশোয়েকে তিলেকমাত্র দেখে ফকির হয়ে তীর্থের পথে বেরিয়ে যাবে সংকল্প করেছিল সারেঙ। সেই মাশোয়েকে তিলেক দেখার পরে সেই সংকল্প মাশোয়ের দাওয়াতেই ফেলে এল সে। তার চিন্তা আর এক পথ ধরে চলতে লাগল।

: বাত্তানী বুড়ী বলেছিল বেটীর বরাত বড় মন্দ। কেন মন্দ ছোয়ার বরাত। ছেলেপুলে নেই বলে? না, স্বামীর কাছ থেকে কোন সাধ আহ্লাদই পূরণ হচ্ছে না কেবল তার খিদ্‌মত করে করে দেহ পাত করে দিতে হচ্ছে বলে? হয় ত তাই। তাই ছোয়া ওই রুগ্ন মানুষটাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে, চেপে ধরে তার উপোসী মনের তাপ জুড়োয়। জুড়োচ্ছিল দেখে এসেছে সে। তা না হলে এই পড়ন্ত বিকেলে হঠাৎ সোয়ামীকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর কাড়বার এই ঘটা কেন? এ সময় গেরস্তর বউরা সংসারের নানা কাজে ব্যস্ত থাকে। ঘর ঝাঁট দেওয়া, জল তোলা, উনুন ধরান,—কত কাজ। আর সেই সব ফেলে কিনা বুকে জড়িয়ে সোহাগ হচ্ছে। কিন্তু কি পাচ্ছে!

কিছুই কি পাচ্ছে? অক্ষম এক পুরুষের বুকে উপোসী এক মেয়ের দেহ কেবল মাথা খুঁড়েই মরছে নাকি! হ্যাঁ তাই। মরছে। মরতেই সে দেখে এল মাশোয়েকে। ক্ষুধার্ত দেহ নিয়ে তিলে তিলে মরছে মাশোয়ে। মাশোয়ের এই মৃত্যুর জন্যে সে-ই ত দায়ী। সে-দায় সে-পালন করবে। ওই রোগীটার কবল থেকে তাকে উদ্ধার করবে সে।

এতক্ষণে সারেঙ যেন বুকে বল পেল। পায়ে জোর ফিরে এল তার। কখন নিজের অজ্ঞাতেই দ্রুত হাঁটতে শুরু করে দিয়েছে সারেঙ। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। গাছে গাছে ফিঙে শালিক বন চড়ুইরা সন্ধ্যার আসর জমিয়ে তুলেছে। কান ঝালাপালা করে কেবল

চারধার থেকে শব্দ আসছে কিচির মিচির। কিচির মিচির। এই শব্দ-পাড়ার অনেক উঁচুতে সন্ধ্যার আকাশ শান্ত। সেই শান্ত আকাশ পাড়ি দিয়ে ঘরমুখো পাখিরা সারি বেঁধে উড়ে যাচ্ছে। দুটি একটি করে তারা এদিকে ওদিকে উঁকি ঝুঁকি মারছে। অপেক্ষা করছে আর একটু আঁধার হবার। আর একটু আঁধার হলেই তারারা দল বেঁধে বেরিয়ে এসে আকাশময় মিষ্টি হাসির চোখটি মেলে রাতের পৃথিবী দেখবে। একটা গাঢ় নীলের ছোপ লাগা সেই সন্ধ্যার শান্ত আকাশের তলায় অশান্ত মোহনার বুকের ওপরে কাঁপছে দুলছে সারেঙের শুলুকখানা। কিন্তু দূর থেকে তার সরল সুদীর্ঘ মাস্তুলটাকে মনে হচ্ছে একটা তীক্ষ্ণধার কালো লোহার শূল, শান্ত আকাশের মর্ম বিদ্ধ করে কঠিন দাঁড়িয়ে আছে। সেই শূল-ফোঁড়া আকাশটার দিকে তাকিয়ে সারেঙের বড় ভাল লাগল। হয় ত মাশোয়ের স্বামীটাকেই মনে পড়ল। তার মনের বাসনার শূলে মাশোয়ের স্বামীর বুকটাকেও অমনি ফুটো করে দিয়েছে যেন মনে হল তার। অথবা অমনি করেই মাশোয়ের স্বামীটার বুকটাকেও ফুটো করে দেবে সে এই সংকল্প করেই যেন খুশি হয়ে ওঠে তার মন।

রতনলালের বুকে মাশোয়েকে দেখে যে অসহ্য জ্বালায় জ্বলে উঠেছিল সারেঙ, নিজেকে অসহায় পরাজিত মনে করে ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠেছিল, এই নতুন সংকল্পের মধ্যে সেই দুর্বল বোধটা মিলিয়ে গেল তার। মিয়োনো ভাবটা কেটে গেল। একটা কঠিন ইচ্ছার উত্তেজনায় তার স্নায়ুগুলি টান টান হয়ে উঠল।

রাতের নির্জনে ডেকে মদ নিয়ে বসে সেই টান টান স্নায়ুতে টোকা মারছিল সারেঙ। সুর তুলছিল। শান দিচ্ছিল মনের সেই ইস্পাত-ইচ্ছাতে। এমন সময় জয় গত রাতের লস্কর দুটো একটা মেয়ে নিয়ে হাজির।—হাব্‌।

সারেঙ মুখ তুলল। তাকাল। একটা মেয়েকে তাদের সঙ্গে দেখে হঠাৎ কী এক কৌতূহল উৎসুক করে তুলল তাকে। কালিনারা

লণ্ঠনটা তুলে এনে মুখের কাছে ধরল মেয়েটার। ভয়ানক হতাশ হল। খড়িমাখা মুখটার দিকে একটা বিষ-নজর হেনে চেঁচিয়ে উঠল—হালা হকুন, যেইখানে যেই মড়া দেখব' সেইটাই থইরা টানাটানি করব'। আদেখিলার ছাও। যা, ঘাটের মড়াটা লইয়া বাগ্।

সারেঙের কর্কশ স্বরটা ধমক না আস্কারা বুঝবার জন্যে একজন মুখ তুলে তাকাল তার দিকে। সারেঙ তাই দেখে ক্ষেপে উঠল—চাইয়া দেখছস কি, আনতে পারবি? আনত' গিয়া ছোয়ারে দইরা, বুজি হিম্মৎ।

ছোয়া! সোভান আল্লা, সে আবার কে? ভাবল লস্কর। লোকটা পাগলা হয়ে গেছে নাকি!

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে অসহিষ্ণু হয়ে উঠল সারেঙ—পারবি না, তবে কুত্তার ছাও খাড়ইয়া রইছছ্ ক্যান? যা চক্ষের ওপর থইক্যা। সারেঙ লণ্ঠনটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে খাটলির ওপরে বসে পড়ল। লস্কর ছুটো তাদের 'ছাবের' মরজি বুঝতে পারল না। বেকুবের মত কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ইতস্তত করল শেষে মেয়েটাকে নিয়ে সরে পড়ল।

মদের বোতলটা তুলে নিল সারেঙ। সবটুকু মাল গবগব করে গলায় ঢেলে দিল। তারপর শূন্য বোতলটা বগলে পুরে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল খাটলির ওপরে। কয়েকটা মুহূর্তের আবর্ত পার হয়ে [illegible] স্বপ্নের মধ্যে নিঃসাড় হয়ে ডুবে গেল।

[illegible]

কয়েক মুহূর্ত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল মাশোয়ে। বুঝি সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিল। তারপরেই ছুটে এসেছে নিজের ঘরে। বালিশ আঁকড়ে উপুড় হয়ে পড়েছে বিছানায়। পরক্ষণেই আবার উঠে বসেছে। ঘরময় পায়চারী করেছে কিছুক্ষণ। নাঃ। অবশেষে জানালার গরাদে ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনের মধ্যেকার নিদারুণ ছটফটানিকে এইভাবেই দমিয়ে দাবিয়ে রাখতে চাইছে সে।

জানালার ফ্রেমে আঁটা বাইরের পৃথিবীতে তখন সূর্য ডুবুডুবু। নারকেল সুপারির মাথায় মাথায় রোদের সোনা। মেঘে মেঘে আবীর। উড়ন্ত পাখির ডানায় পর্যন্ত তার মাখামাখি। এত আলো। এমন সোনা-রোদ। তবু পথ দেখছে না মাশোয়ে। বারে বারে চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুটি হারিয়ে ফেলছে। চিন্তাটা ঢেউ হয়ে কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে কেবলই ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। বড় হয়ে হয়ে যাচ্ছে। আকাশে লাট-খাওয়া ঘুড়ির মত উদ্‌ভ্রান্ত চিন্তাটা কেবলই ডাইনে বাঁয়ে পাক খাচ্ছে, কোথাও আশ্রয় পেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না।

ঘুরে ঘুরে একটা প্রশ্নের কাছে এসে সে কেবলই বিষম খাচ্ছে: আলিজান আবার আসবে। রতনলালের বুকে তাকে দেখে যাবার পরেও আবার আসবে। কেন? কেন আসবে আবার; কি দরকার, কি মতলব? সে কি জানতে পেরেছে মাশোয়ে পেশাকর। স্বামী বলে একটা রুগ্ন পুরুষকে সামনে রেখে সে তার শরীর বেচে খাচ্ছে। কাল রাতে সে কি চিনতে পেরেছিল তাকে। চিনতে পেরেই কি সে সব খোঁজ-খবর নিয়ে ছুটে এসেছিল তাকে দাবি করতে। তাকে কেড়ে নিতে। সে কি তাকে তার লালের বুক থেকে টেনে নিয়ে যাবে। সে কি বলবে, আবার বিয়ে করেও যদি তুমি আমার কাছে এক রাত্রি কাটাতে পেরে থাক তবে আরো অনেক রাত্রি—এরপর থেকে জীবনের সব ক'টা রাত্রি আমার কাছে কেন কাটাবে না। আমার শক্তি আছে সামর্থ্য আছে পয়সা আছে। সবার ওপর আছে তোমার ওপরে আমার দাবি। তুমি আমার একদিনকার বউ। একদিন্ তোমাকে নিয়ে আমি অনেক রাত্রি আনন্দে কাটিয়েছি। দৈববশে আমাকে চলে যেতে হয়েছিল বলে, দীর্ঘদিনে আমি আর ফিরে আসতে পারিনি বলে বিয়ে ত আমাদের বাতিল হয়ে যায় নি। যত দিনে হোক আমি যখন আবার এসে পড়েছি আমার সঙ্গেই তোমাকে যেতে হবে। আঁৎকে ওঠে মাশোয়ে। রতনলালের বুকের থেকে তাকে কেড়ে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাবে আলিজান। কিন্তু সেই

দাবিই যদি সে করবে তবে আজ কেন করল না। আজই কেন এসে হাত ধরে তাকে টান দিল না। আবার আসছে-কালের জন্যে কেন সে তার দাবি মুলতবী রাখল।_ দেখাটা পর্যন্ত কেন সে করল না। সে কি ভেবেছে, আজ রাতে আবার মাশোয়ে তার শুলুকে আসবে। তখন সে তাকে আটকে রাখবে আর ছাড়বে না। তাই যদি ভেবে থাকে তবে আবার কাল আসবে এ কথা বলে গেল কেন?

কিছুই দিশা করতে পারে না মাশোয়ে। একটা অজানা ভয় তার বুকের মধ্যে কেবল দাপাদাপি করতে থাকে। সে ভাবতে থাকে, আলিজান হয় ত তার শুলুক থেকে দস্যুমতন কয়েকটা লস্কর নিয়ে আসবে। তাকে মুখে কাপড় বেঁধে ধরে নিয়ে যাবে। ইস্, ধরে নিয়ে গেলেই হল। না, সে যাবে না। রতনলালকে ফেলে সে কোথাও যাবে না। কেন যাবে? আলিজান কে? কেউ না। যে একদিন নিঃশব্দে চলে যেতে পারে তারপর দীর্ঘ দিনে আর একটিবার খোঁজ পর্যন্ত করতে আসতে পারে না তার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? কোন সম্পর্ক নেই। আজ সে তার অতীত। অপরিচিত। আজ সে অন্যের বউ। আলিজানের কেউ না। আজ আর আলিজানের কোন অধিকার নেই তার ওপরে। আলিজান এলে এই রূঢ় কথাটা সে তার মুখের ওপরে পরিষ্কার বলে দেবে। বলে দেবে, আর যেন না সে কোনদিন এ-মুখো হয়। যদি সে ফের আসে, তার দিকে হাত বাড়ায় ফের, তা হলে মাশোয়ের হাতে তাকে মার খেয়ে যেতে হবে। জান রেখে যেতে হবে।

মেয়ে-মন অদ্ভুত! আলিজান তাকে একেবারেই ভুলে গেছে, সারারাত তাকে বুকের মধ্যে পেয়েও চিনতে পারল না; এই আপসোসে আজ সকালেই মাশোয়ের কত শোক, কত কান্না। আর সেই সকাল বিকেলে গড়িয়ে আসতে আসতেই যখন সে শুনল আলিজান তাকে ভোলে নি, এসেছিল এবং আবার আসবে, তার মনে কী ভয় কী আতঙ্ক। রতনলালের বুক থেকে সে তাকে কেড়ে নিয়ে যাবে এই ভাবনাতেই বারে বারে সে কাঁটা দিয়ে উঠছে। বুকের

মধ্যে ছটফট করে মরছে। সেই অসহ্য ছটফটানিতে অস্থির হয়ে উঠে সে এইবার ছুটে এসে রতনলালের বুকে মুখ গুঁজল।

—কি ব্যাপার, তুমি গেলে না?

—না।

রতনলাল আর কোন প্রশ্ন তুলল না। চুপ থেকে তার মাথায় চুলে আঙুল বুলোতে লাগল।

মাশোয়ের ইচ্ছা হচ্ছিল বলে—লাল আমারে যদি কেউ তোমার বুক থইক্যা কাইড়া নিতে চায় তুমি কিছুতেই যাইতে দিও না। এমন কি আমিও যদি… ..

হঠাৎ মাশোয়ে শিউরে উঠল। দুই হাতে রতনলালকে জড়িয়ে ধরল সজোরে। সেও যদি রতনলালকে ছেড়ে চলে যেতে চায় রতনলাল যেন এ ভাবে তাকে আঁকড়ে ধরে রাখে। যেতে না দেয়।

—কি, হল কী? এতক্ষণে আবার প্রশ্ন করল রতনলাল।

—আমি তোমারে একলা ঘরে রাইখ্যা আর যামু না।

—কেন?

—তাইলে আমি ফিরা আইয়া আর তোমারে দেখতে পামু না। আমার কাছের থইক্যা তোমারে কাইড়া লইয়া যাইব।

—ধ্যাৎ, কে কেড়ে নেবে?

মাশোয়ে জবাব দেয় না। রতনলাল বুঝতে পারে মাশোয়ে নিঃশব্দে কাঁদছে।

এমনি করে নিঃশব্দে কেঁদে কেঁদেই একটা অজানা ভয়ের নিকটতর হতে লাগল মাশোয়ে। রাত কেটে গিয়ে দিন হল। যথারীতি সংসারের কাজে নিজেকে ব্যাপৃত করে ফেলল মাশোয়ে; কিন্তু যে কোন সময়ে আলিজান এসে পড়বে এই অনুভূতি একটা কাঁটার খোঁচার ব্যথার মত অনুক্ষণ তার মনের মধ্যে জেগে রইল। এই অস্থিরকর অনুভূতি নিয়ে সমস্ত কাজের মধ্যে তার মনের একটা অংশ পথের দিকে চেয়ে উৎকর্ণ হয়ে রইল। কিন্তু সকাল গড়িয়ে দুপুর হল

আলিজান এল না। দুপুরও গড়িয়ে চলল আলিজানের দেখা নেই। মনের মধ্যে যে উত্তেজনা সেই থেকে প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছিল দুপুর গড়িয়ে পশ্চিমে ঢলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে উত্তেজনা মরে মরে এক বিপুল অবসাদ হয়ে মাশোয়েকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। আলিজান এল না, সে আর আসবে না। ব্যর্থ প্রতীক্ষার দিন শেষ। গহন এক দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে যখন এ সিদ্ধান্ত করে ফেলল মাশোয়ে তখন তার দেহে আর এতটুকু বল নেই। দুটো পা কাঁপছে, বুকের মধ্যে দুপ্ দুপ করছে! সে একটা হোগলা বিছিয়ে দাওয়ায় শুয়ে পড়ল। চোখ বুঁজে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সারেঙ টের পেল গত রাত্রির কঠিন সংকল্পটা যেন আর তেমন কঠিন নেই; মিছ্রির মত, ঠাণ্ডা লেগে তার অনেকখানিই গলে খয়ে গেছে। অনেকটা নরম হয়ে গেছে সে। তার মনে হল কি দরকার ছোয়াকে গিয়ে আর বিরক্ত করার। বেচারা যদি কারো বুকে আশ্রয় পেয়ে থাকে, সুখী হয়ে থাকে, কি দরকার সে আশ্রয়ে গিয়ে হানা দেবার। দুঃখ দেবার। মাশোয়েই হয় ত তা চাইবে না। আমল দেবে না তাকে। যে ব্যক্তি দুঃখের সময়ে অভাব অনটনের সময়ে তাকে আশ্রয় দিয়েছে তাকে আঁকড়েই থাকবে। যে ব্যক্তি তাকে ফেলে চলে গেছে ফিরে আর কোনদিন খোঁজটুকু পর্যন্ত করে নি সে ব্যক্তি দীর্ঘ দিন পরে হঠাৎ গিয়ে হাজির হলে তাকে সে তাড়াই করবে, বেইমান দুশমন বলে গালই পাড়বে, আদর করে বসতে দেবে না, হাসিমুখ করে কথা বলবে না। তবে কি কাজ গিয়ে। তিলেকের দেখা? তাতহয়েছে। মুখের কথা? তা নাই বা শোনা হল।

সারেঙ নানা ভাবেই নিজেকে প্রবোধ দিল। তবু পাছে মাশোয়ের টানে অজ্ঞাতসারে সেদিক পানে রওনা হয়! সে নিজেকে অন্য কাজে নিযুক্ত করল। মহাজনদের গদিতে গদিতে ঘুরল। কার কত মাল

যাবে তার হিসেব নিল। একদিনের মধ্যেই শুলুক বোঝাই করে দিতে সবাইকে অনুরোধ করল। সে আজকের দিন আর আসছে কাল—এর বেশি এক পহরও থাকবে না জানিয়ে দিল সকলকে। এসব করে ঘুরে ফিরে শুলুকে আসা স্নান খাওয়া সাঙ্গ করা প্রভৃতি কাজেও সে ধীরে সুস্থে অনেকটা সময় নিল তবু বেলা যেন আর কাটতে চায় না। দুপুর গড়াতে চায় না বিকেলের দিকে। অগত্যা নিজেই সে বিছানায় গড়াগড়ি দিতে লাগল। ভাতের নেশায় চোখ জুড়ে এক সময়ে তন্দ্রাও এল। সে তন্দ্রা ভাঙতেও বেশিক্ষণ লাগল না। তবে হ্যাঁ, চেয়ে দেখল সারেঙ, দিনটা বিকেলে হেলে পড়েছে এখন। কোন-মতে রাতটায় পৌঁছতে পারলেই নিষ্কৃতি; কিন্তু সে নিষ্কৃতি আসবার আগে এক মহাজনের গদি থেকে ডাক এল। মাল তোলা সম্পর্কে তাদের কি কথাবার্তা আছে। সারেঙ ভেবেছিল শুলুকের মধ্যে নিজেকে বন্দী করে রেখে মাশোয়ের টানটা কাটাবে আজ। দেখল এও মন্দ হল না। হাঁটাহাঁটির মধ্যে সময়টা অন্যমনস্ক হয়ে ভালই কাটবে। সে খোসমেজাজে বেরিয়ে পড়ল। মহাজনের গদিতে এল। কথাবার্তা হল কিন্তু যা ভেবেছিল সারেঙ তা হল না। সময় কাটল না। সবে বিকেল। সন্ধ্যা হতে আরও দেরি, এখন কি করে! এই কী-করে অবস্থার শূন্য মনের আকাশে রামধনুর মত মাশোয়ের ছবি ভেসে উঠল। সেই ছবির দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে নিজের অজ্ঞাতেই সে রওনা হল মাশোয়ের বাড়ীর পথে।

০

মাশোয়ে চোখ বুঁজে হোগলার ওপরে উপুড় হয়ে পড়েছিল অনেকক্ষণ। হঠাৎ চিৎ হয়ে চোখ মেলে তাকাল। না, রাত হয়নি। সন্ধ্যাও না। গাছের মাথায় রাঙা রোদ। একটা নারকেল গাছের ডালে বসে কয়েকটা টিয়ে গায়ে রোদ মাখাচ্ছে। কয়েকটা বকও উড়ে এসে বসল তাদের পাশে। ভয় পেয়ে ছুটো টিয়ে চেঁচামেচি করে উড়ে পালাল। বক ক'টাও কয়েক মুহূর্ত ডাইনে বাঁয়ে গলা টানা দিয়ে তাকাল, তারপর পাখা মেলে দিল আকাশে। কার্তিকের বাতাস

ঝিরঝির করে বইছে। চারধার নির্জন। আকাশটা কী নীল। গাছের পাতা কী সবুজ।

কিন্তু কতক্ষণ আর এসব অবান্তর ছবির মধ্যে মন ধরে রাখা যায়। মনের এক প্রান্তে যে অস্থির একটা আশা বারে বারে পথের দিকে চেয়ে আছে সে-ই হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ওঠে। হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় মাশোয়ে। ধীরে ধীরে বাইরে আসে। মেহেদি পাতার বেড়ার কাছে এসে দাঁড়ায়। একটুক্ষণ এধারে ওধারে চোখ বুলোয়। শেষে ছেঁচা বাঁশের বেড়াটা ঠেলে বেরিয়ে আসে পথে। পথটা বাঁক পর্যন্ত দেখা যায়। শূন্য পথটা খাঁ-খাঁ করছে। বোবা চোখ মেলে মাশোয়ে তাকিয়ে থাকে সেই শূন্য পথের দিকে। খানিকক্ষণ। তারপর আকাশে চোখ ফেরায়। কী ভাবতে থাকে মনে মনে। একটা অবসাদ এবং উত্তেজনা একযোগে তার রক্তের নালা বেয়ে মাথায় বুকে ঘুরতে থাকে।

মাশোয়ে তার বাড়ির সামনে মেহেদি পাতার বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছে এমন ছবি ভাবতে পারেনি সারেঙ। তাই সেই অভাবিত ছবি দেখে সে হকচকিয়ে গেল। কিন্তু ডেকে তাকে বিরক্ত করল না। নিঃশব্দে এসে তার নিকটে দাঁড়াল।

মাশোয়ে চমকে উঠে ফিরে তাকাল। কোন কথা বোবা কণ্ঠে ফুটল না মাশোয়ের। উত্তেজনা আর অবসাদ এক যোগে যা তার রক্তের নালা বেয়ে তার স্নায়ুতে স্নায়ুতে পাক খাচ্ছিল, মাথায় বুকে ঘুরছিল, তাই যেন এবার তার মনের মধ্যে এসে জড়ো হয়ে ধাক্কাধাক্কি শুরু করল। অবসাদটা ডুবে গিয়ে উত্তেজনাটাই সেখানে টগবগ করতে লাগল।

মাশোয়ে কথা বলে না।

সারেঙ শুধোয়—কি, চিনতে পারতেছ না, আমি আলিজান।

সারেঙ গতকাল তার পায়রাডাঙা যাওয়ার কথা, সেখানে একটা লোকের কাছে তার খোঁজ পাওয়ার কথা বলল। বলল—সেই খবর পাইয়া কাইলোই আইছিলাম তোমার লগে দেখা করতে।

আইয়া দেখলাম তুমি সুখেই আছ। তোমারে আর বিরক্ত করলাম না। তখনই চইল্যা গেলাম। কিন্তু থাকতে পারলাম না। তোমার সামনে খাড়াইয়া, তোমার মুখের দিকে চাইয়া, দুইটা কথা না কইয়া, দুইটা কথা না শুইন্যা থাকতে পারছিলাম না। মনে শান্তি পাইতে আছিলাম না। তই আইজ আবার আইছি। কিন্তু বুজতে পারছি, তুমি তোমার বেইমান আলিজানের লগে বাৎ চিৎ করতে গিন্না বোধ করতে আছ। আমি তোমার সামনে খাড়ইয়া থাইক্যা তোমারে আর বিরক্ত করুম না। খোদার কাছে আরজি করি তুমি আরও সুখী হও।

মাশোয়ে বুঝল তার ভয় মিথ্যা। কাল রাতের মাশোয়েকে সে চিনতে পারে নি। দশ বছর আগেকার মাশোয়েকে সে দেখতে এসেছে। অমনি ভয়ের উত্তেজনা তার অভিমানে গর্জে উঠল। এতক্ষণে এইবার সে কথা বলল— আমি যখন তোমার বউ আছিলাম তখন আমারে দিব্বি ছাইড়া যাইতে পারছ। আইজ যখন আমি পরের বউ হইছি তখন আইছ আমার খবর করতে। আমার লগে দুইটা কথা কওনের লগ্যা তোমার পরাণ কান্দে। কোন্ মুখে কও এই কথা। শরম লাগে না? তুমি যাও। অক্ষুনি যাও।

কর্কশ কঠিন রূঢ় কথাগুলি সূচের খোঁচের মত বিঁধল এসে সারেঙের বুকে। সে কি কথা বলতে মুখ তুলল কিন্তু বলল না। মুখ ফিরিয়ে রওনা হল।

সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছে আলিজান। মাশোয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোবা চোখ মেলে দেখতে লাগল। বুকের মধ্যে ঝড়ের উত্তেজনা তার। সে উত্তেজিত ঝড় তার বুকের মধ্যে কবর-দেওয়া ফেলে-আসা জীবনটাকে খুঁড়ে খুঁড়ে টেনে বার করছিল। স্মৃতির অনেক তুচ্ছ জিনিস—ধুলোবালি খড় কুটো ঝরা মরা পাতার রাশির মত উড়িয়ে ছড়িয়ে ছত্রখান করে দিচ্ছিল। সেই ঝড়ের ঝাপটায় মাশোয়ে থরথর করে কাঁপছিল। তার আলিজান। তার আলি। যাকে বুকে করে বুকে ভরে কেটেছে তার অনেক বিহ্বল রাত্ত মুখর দিন, তারপর দীর্ঘকাল যার স্মৃতি চোখের মণিতে প্রদীপের মত জ্বালিয়ে সে প্রতীক্ষায়

পথ চেয়ে ছিল। পরশু রাতেও [illegible] ভাবে যার বুকে সে আশ্রয় পেয়েছিল, তাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে মাশোয়ে। সে জেনে যাচ্ছে মাশোয়ে আজ আর তার নয়। তার নেই। সে অন্যের। আর কোন দিন কোন অজুহাতেই সে আর আসবে না মাশোয়ের কাছে। কিন্তু কি জন্যে মাশোয়ে আজ আর তার নয়। তার নেই। সে কথা ত বলা হল না। বলে দিতে পারল না তাকে : কার জন্যে মাশোয়ে আজ অন্যের। মাশোয়ে আজি সকলের ভোগের। সে তো সে-কথা জেনে গেল না। সে যে সুখে আছে, অন্য এক পুরুষের বুকে আশ্রয় পেয়েছে এই শুধু সে জেনে গেল। সেই জানা যে কত বড় মিথ্যে সে কথা ত তাকে বলে দেওয়া হল না। মাশোয়ে কেমন সুখে আছে সে ত তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল না। বেইমান মানুষটা জানাল না যে, তার নিষ্ঠুর আচরণে আর একটা জীবন কি ভাবে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে।

—আলিজান, আলি। চিৎকার করে উঠে মাশোয়ে দৌড়োল। সারেঙ অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল। ডাক শুনে সে ফিরে তাকাল। হকচকিয়ে গেল। ছোয়া তাকে ডাকছে। তার ছোয়া। কিন্তু ছুটে গিয়ে তাকে ধরতে পারল না সারেঙ। বিহ্বল দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে রইল। মাশোয়ে ছুটে এসে পথ আগ্‌লে দাঁড়াল তার। কথা বলতে পারছিল না সে। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছিল। হাপরের মত উঠছিল পড়ছিল বুকটা। ব্লাউজের টিপকল খুলে গেছে। মনে হচ্ছে পাতার আড়ালে ছোট ছুটো হল্‌দে বাতাবীনেবু ঝড়ের দাপটে ছুলছে, কাঁপছে, আছাড় খাচ্ছে। সারেঙের বুকের মধ্যেটা কামনায় সিরসির করে উঠল। এই ব্যাকুল বেপথু চেহারাটা সে ভাবতে পারেনি। মগ মেয়ের যে চেহারাটা সে কল্পনা করে রেখে ছিল তার সঙ্গে এর মিল নেই। ক্রুদ্ধ কুপিত ভয়ানক সেই সবের বদলে এ কী এ দেখছে সারেঙ।

মাশোয়ে ছু হাত চেপে ধরল সারেঙের, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—চইল্যা যাইতে আছ' যাও। আর আইয় না। কিন্তু যাওনের আগে

জাইন্তা যাও : তুমি যারে মাইর‍্যা রাইখ্যা গেছিলা রত্তনলাল তারে আইন্তা গোর দিছে। আইজ যারে তোমার সামনে দেখতে আছ' সে তোমার সেই ছোয়া না। গোরের পেত্নী। আমি···আমি ·····

একটা সাংঘাতিক স্বীকারোক্তি করতে গিয়ে মাশোয়ে আর নিজেকে সামলাতে পারল না। সারেঙের বুকেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

নদীর ঢালু বালি পাড়ে কাল সকালে মাশোয়ে যেখানে তার বাসি মুখ ধুয়েছিল, সারেঙ তাকে পাঁজা কোলে করে সেখানে নিয়ে এল। বালির ওপরে তাকে শুইয়ে দিয়ে আঁজ্লা ভরে জল এনে তার মুখে চোখে ছিটিয়ে দিতে লাগল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মাশোয়ের কাঠ দেহটা নরম হল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বালির ওপরেই পাশ ফিরে শুল সে। মূর্ছা ভেঙে চেতনার কুয়াসার মধ্যে আচ্ছন্ন আছে মাশোয়ে। থাক। সারেঙ তাকে ডাকল না। চুপ করে এসে তার পাশে বসল।

কার্তিকের নীল আকাশে ছেঁড়াখোঁড়া পেঁজা তুলোর মত ছোট বড় মেঘ। এইখানে একটা আর ওইখানে একটা। যেন সারাদিন ঘাস খেয়ে খেয়ে ভরা পেটে জিরোচ্ছে কতকগুলো গরু মোষ। এক প্রান্তে আধখানা বাঁকা চাঁদ তাদের তৃপ্তি দেখে খুশিতে হাসছে। সে হাসি ঠিকরে পড়ছে মোহনার জলে, বালিতে, ঝোপে জঙ্গলে। সে হাসি একখানি রিমরিমে ওড়নার মত ঢেকে আছে সমস্ত চরাচর। অশান্ত নদী সেই চাঁদের হাসি গায়ে মেখে ফুঁসছে ফুলছে। চাঁদের শুধু হাসিটি গায়ে মেখে খুশি নয় সে, গোটা চাঁদটাকেই সে বুকে পুরে ফেলতে চায়। তাই ক্ষণে ক্ষণেই সমস্ত নদীটা যেন ঢেউ হয়ে আকাশ ধরতে চায়। পারে না। বেদনায় ক্ষোভে পাড়ের ওপরে আছড়ে পড়ে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

সারেঙও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মাশোয়ে বুঝি ঘুমিয়ে পড়ল। অশান্ত নদীর বুকের নিঃশ্বাসের মত লম্বা লম্বা শ্বাস ফেলছে মাশোয়ে। অতি সন্তর্পণে সারেঙ তার হাতটা মাশোয়ের চুলের ওপরে রাখল। অমনি চমকে উঠল মাশোয়ে। উঠে বসল।

—তুমি যাও নাই অখনও ?

ভীত সারেঙ চুপ করে রইল।

মাশোয়ে উঠে দাঁড়াল—যাও নাই যখন, আস' আমার লগে। তুমি দ্যাখছ আমি নাকি খুব সুখে আছি, আস,' কি সুখে আছি একবার দেখাইয়া দেই তোমারে। সারেঙের হাত ধরে একেবারে রতনলালের শিয়রে নিয়ে এল তাকে।

— লাল, দেখ কারে ধইরা আনছি।

—কে ?

—একটা শুলুকের সারেঙ। তুমি যদি সাহস কর তবে এর শুলুকে চইড়া আমরা কক্সবাজার যাইতে পারি।

—তুমি যদি নিয়ে যেতে পার যাওয়ার সাহস আমার আছে। বসুন সারেঙ সাহেব। সারেঙকে বসিয়ে রতনলাল তার রোগের ইতিহাস বলল। বলল মাশোয়ের অসাধারণ সেবার কথা, পরিশ্রমের কথা, ভালবাসার কথা। তারপরে উঠল সারেঙ—বলল—যায়ন যদি তৈয়ার হয়ন, পরশু দিনোই রওনা হইতে হইব'।

সারেঙ বেরিয়ে এল ঘর থেকে, মাশোয়ে তাকে আগিয়ে দিতে উঠোনে এসে দাঁড়াল।

সারেঙ তার হাত ধরে টান দিল।—খাড়ইলা ক্যান, আস'।

—কই যামু ?

—যাইবা আমার লগে। এইখানে এই মড়া আগলাইয়া তোমারে আমি থাকতে দিমু না। আমার উপুর রাগ কইরা তুমি একটা মড়া বিয়া করছ। তারে আগলাইয়া রইছ যখের মত। এ আমার সহ্য অইতেছে না।

মাশোয়ে ভয়ে চিৎকার করে উঠল—আমারে ছাড়,' আলিজান তোমার পায়ে পড়ি।

—ছাড়তে পারি। আগে কও, তুমি সত্য কথা কইছনি!

—কি ?

—অই যে কইলা আমার শুলুকে চইড়া তুমি রোগী লইয়া কক্সবাজার যাইবা।

—না সত্য কই নাই। লালের কাছে তোমার একটা পরিচয় ত দিতে হইব সেইজন্য কইছি। তুমি যাও আলিজান,' আর আইয় না।

—না, যামু না। বেপরোয়া হয়ে উঠল সারেঙের গলা। তুমি যদি আমার লগে যাইতে না চাও তবে অই লোকটারে আমি গলা টিপ্যা মারুম।

—আলিজান! রাত্রির নির্জন খানখান করে মাশোয়ের গলা চিরে একটা আর্তস্বর বেরিয়ে এল।

—রাজি হও ছোয়া। কঠিন একটা চাপ হাতে, কর্কশ একটা শব্দ মুখে। এ দুটো এক যোগে মাশোয়ের স্নায়ু অবশ করে দিল। তবু প্রাণপণে নিজেকে সচেতন রেখে সে বলল—কও, তইলে তুমি লালরে মারবা না।

—না মারুম না। তারে হাসপাতালে ভর্তি কইরা দিমু।

—দিবা? সত্যি? যেন স্বস্তির আশ্রয় পেল মাশোয়ে।

—দিমু। দৃঢ় কণ্ঠে বলল সারেঙ।

মাশোয়ে গলা জড়িয়ে ধরল সারেঙের। তুমি জান' না আলিজান, তোমারে হারাইয়া কি কষ্ট আমি পাইছি। কষ্টে কষ্টে আমি মইরা গেছি। মইরা আমি পেত্‌নী হইছি আইজ। আইজ আমি পেশাগর। শরীর বেইচ্যা খাই।

—বুজজি, ওই লোকটারে বাঁচানের লইগ্যা আইজ তোমার এই হাল। এত কষ্ট। হঠাৎ মাশোয়েকে বুকের মধ্যে নিবিড় করে ধরে বলল—পরশু রাইতে তুমি, তুমিই তইলে আমার কাছে গেছিলা, আমার কাছে ছিলা। কি বে-ইখতিয়ার হইয়া গেছি আমি ছোয়া, তোমারে সেদিন চিনতে পারি নাই। টিমটিমা আলোতে মদের ঝোঁকে একটু একটু সন্দ হইলেও মনে কামড় দেয় নাই। অথচ কি বেহেস্তের তৃপ্তিই না তোমারে বুকের মধ্যে কইরা আমি পাইছিলাম। ছোয়া সবই আমার কসুর। আমার নসিব। আমি বেইমানি কইরা তোমারে ছাইড়া গেছি। আমাগ ছাড়াছাড়ি হওনে দুইজনেই আমরা বেহেস্ত থইক্যা দোজখে পড়ছি। আমি যে কি হইছি আইজ, তা তুমি নিজের

চক্ষে দেখছ,' তুমি কি হইছ' তাও দেখলাম। জানলাম। অখন কও। আবার আমরা দুইজনে মিলুম। ঘর বান্দুম্। আবার সেই বেহস্ত গড়ুম ছোয়া।

—তোমার যা ইচ্ছা। লালরে হাসপাতালে দিলে আমার একটা শান্তি। শান্তমনে তখন তোমার খুশি মতন চলতে পারুম আমি।

কথাটা সারেঙের বুকে আগুন জ্বালল। তার বুকের মধ্যে মাথা রেখেও কিনা ছোয়া তার লালের ভাবনা ভাবে! হিংসায় হিংস্র হয়ে ওঠে সারেঙ। ভাবে কক্সবাজার পর্যন্ত ওই হারামিরে টেনে নিয়ে যাবার দরকার কি, এখানেই গলা টিপে শেষ করে রেখে গেলেই ত হয়। কিন্তু না, তাতে ছোয়ার মন বিগড়ে যাবে। ছিঁড়ে যাবে তার মনের সুর বাঁধা তার। তা সে চায় না। ছোয়ার ভালবাসার সুরে বাঁধা আস্ত নিটোল মনটা কেড়ে কামড়ে পাওয়া যাবে না। কৌশলে ধীরে ধীরে রতনলালের বুক থেকে উপড়ে এনে আবার তার মনের জমিতে পুঁততে হবে। তবেই আবার সে তাজা কচিপাতার নরম ছায়াতে তার বুক ভরে দেবে। ভেবে মন স্থির করল সারেঙ। শান্ত হল। শান্ত গলায় বলল—হ, রতনলালরে কক্সবাজারে নিয়া হাসপাতালে দিমু। তার চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করুম। তুমি ভাল পরামর্শ দিছ'। তই খোদার দোয়া পামু আমরা।

—বেশ তইলে আইজ যাও।

—তুমি চল'না আইজ শুলুকে।

—না কক্সবাজার যদি যাইতে হয় গুছগাছ করতে হইব না?

—তোমারে যে আমার ছাইড়া যাইতে মনে কয় না।

—থাউক, আট বছর পরে আইয়া আইজ আর [illegible]পানা করতে হইব না।

সারেঙের বুক থেকে নিজেকে মুক্ত করে মাশোয়ে একছুটে বাড়ির মধ্যে পালিয়ে গেল।

তৃষিত চোখ মেলে সারেঙ সেই দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর দাঁতে দাঁত ঘষে একটা নির্মম শপথ উচ্চারণ করে মুখ ফিরিয়ে রওনা হল।

ভর্‌ভর্‌ করে ছুটে চলেছে শুলুক। গলুইয়ে লেগে ঢেউ আর স্রোত ফুলে ফেঁপে ফেনা হয়ে দুপাশে ভাগ হয়ে ভেঙে যাচ্ছে। অনেক দূর পেছন পর্যন্ত সেই ভাঙা দুভাগ ফেনার দাগ দেখা যায়।

কার্তিকের মেঘনা এখন শান্ত। সিংহ ঘুমোচ্ছে। আকাশের কোনো কোণে যদি একটু কালো মেঘ দেখা যায় আর তার ফোকর থেকে ঝড়ের শঙ্খচূড়টা হঠাৎ ফণা তুলে ফুঁসে ওঠে, সে নিঃশ্বাস এসে লাগে ঘুমন্ত সিংহের গায়, অমনি ঘুম ভেঙে যাবে তার। কেশর ফুলিয়ে তেড়ে উঠবে। গর্জে উঠবে। কার্তিক মাসে সে ভয় নেই। সেই দুশমন মেঘ আর তার গর্তের সর্বনেশে শঙ্খচূড়টা এখন অনুপস্থিত। তারা হিমালয়ের কোনো অরণ্য-নির্জনে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে। শুলুক তাই নিশ্চিন্ত। নিরুদ্বেগ স্বচ্ছন্দে জল কেটে চলেছে। ডানা মেলে দিয়ে জল ছিটিয়ে চলেছে যেন একটা রাজহাঁস। দুলছে না, কাঁপছে না, আছাড় খাচ্ছে না।

রতনলালের তবু কষ্ট। ডরার ভেতরে একটা নাক-পোড়া গুমট গন্ধে তার নাড়ী বার বার মোচড় খাচ্ছে। এটা প্রথম দিন ছিল না। দ্বিতীয় দিন থেকে শুরু হয়েছে। এর জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল মাশোয়ে। প্রচুর পাতিলেবু লেবুপাতা আতর ইত্যাদি এনেছিল। বমির ভাব হলেই লেবুপাতা কচলে নাকের কাছে ধরে মাশোয়ে, একটুকরো লেবু জলে মিশিয়ে খেতে দেয়। ঘরময় আতর ছড়ায়। প্রাণপণ করছে মাশোয়ে। রতনলালকে কি করে সুস্থ রাখবে, শান্তি দেবে সর্বক্ষণ সেই ভাবনা মাশোয়ের। আর একজন যে তার সঙ্গ পাবার জন্যে আকুল হয়ে থাকে সে দিকে তার খেয়াল থাকে না। সে এসে যদি ডাকে উঠে যায় অবশ্যি। তার নিভৃত অবসরকে উষ্ণ সান্নিধ্যে ভরে তোলে। আদর করে। আনন্দ দেয়। খুশী করতে খুশী রাখতে প্রাণপণ করে। একটা বড় ক্ষুধা সায়েবের। সে ক্ষুধার

তৃপ্তি দিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে যায় মাশোয়ে। তার তুলো নরম শরীর পেঁজা পেঁজা হয়। তবু সারেঙকে বড় ভাল লাগে মাশোয়ের। একটা বলিষ্ঠ পৌরুষের উত্তাল গভীরে নারীত্বের নিবিড় অবগাহন যেন। তৃপ্তিতে মাশোয়ের সমস্ত সত্তা সিক্ত হয়ে যায়। সারেঙকে আরও বেশি করে ভালবাসে মাশোয়ে। আরও বেশি করে ভালবেসে সার্থক হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু তবু বেশিক্ষণ থাকে না। থাকতে পারে না। অসুস্থ রতনলালের জন্যে মন কেমন করে। ছটফট করে চলে আসে। সারেঙ তাই বুঝে উঠতে পারে না মাশোয়ের মন। অথবা হয় ত মেয়েদের মন বুঝবার মত মন নয় সারেঙের। সে ভাবছিল—ছোয়া তাকে দেহ দিচ্ছে বটে কিন্তু মনটা তার পড়ে আছে রতনলালের কাছে। রতনলালকেই সে ভালবাসে। ছোয়া তাকে হাতে রাখছে শরীর দিয়ে, শুধু টাকা কড়ির সুযোগ সুবিধেটা পাওয়ার জন্যে।

রাগে চোখ জ্বলে সারেঙের। বুক পুড়তে থাকে ঈর্ষায়। হিংসায় নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে সে। চায় তক্ষুনি ছুটে গিয়ে রতনলালকে টেনে এনে ছুঁড়ে ফেলে দেয় জলে। কিন্তু ভাবে কি দরকার মরা মানুষকে মেরে। নিজেই টেঁসে যাচ্ছে, যাবে একদিন। বেশি দিন ভোগাবে না। কিন্তু সেই অল্প কয় দিনও সহ্য হয় না সারেঙের। রতনলালের মাথাটা কোলে নিয়ে বসে থাকে মাশোয়ে। অপলক চোখে চেয়ে চেয়ে ওই ফ্যাকাশে পাঙাশ মুখে কি দেখে সে সেই জানে কিন্তু সারেঙের অসহ্য লাগে। এত ভালবাসবে কেন মাশোয়ে রতনলালকে। কি অধিকার আছে ওই রোগীটার মাশোয়ের এত ভালবাসা কেড়ে নেবার। তার মাশোয়েকে ওই বেটাই পর করে দিয়েছে। বেটা দুশমন। নিসপিস করে ওঠে সারেঙের হাত। কঠিন হতে থাকে তার মন। সংকল্প।

তৃতীয় দিনে শুলুক এসে ভিড়ে দৌলতখাঁ। রতনলাল আরও অস্থির হয়ে পড়ে। বমি শুরু হয়। অল্প রক্তও ওঠে। মাশোয়ে ছুটে এসে সারেঙের পায়ে পড়ে। মাথা খোঁড়ে। রতনলালকে নিয়ে দৌলতখাঁ নেমে থাকবার জন্যে বায়না ধরে। সারেঙ দাঁতে দাঁত চেপে শোনে ; কিন্তু মেজাজ সামলে থাকে। মাশোয়ের পিঠে হাত

বুকোর ঃ শান্ত কণ্ঠে বোঝায় ঃ এখানে হাসপাতাল নেই। এ রোগের ডাক্তারও নেই এখানে। তাছাড়া আর ত মাত্র ছুটো দিন, তার পরেই কক্সবাজার। এ ছুটোদিন রতনলাল সামলে যেতে পারবে।

পারবে কিনা জানে না মাশোয়ে। তবু আর তর্ক করে না। নিঃশব্দে উঠে চলে যায়। সারেঙের মনে হয় ঃ তার বঁধুয়া যেন তার সুমুখ দিয়েই আর একজনের বাড়ি চলে গেল।

নিজেকে বড় ছোট মনে হতে থাকে সারেঙের। অপমান বোধ করতে থাকে। তার মত একটা শক্ত সমর্থ জোয়ান মানুষ কেউ না! কিছু না! একটা ভিখিরী যক্ষ্মার রোগীই সব! সব!

নাঃ। মাশোয়েকে এভাবে পরের হতে, পর হয়ে যেতে দেবে না সে। কেড়েই নেবে সে তাকে রতনলালের কাছ থেকে।—হালা হমুন্দির পুত তরে আমি দেইখ্যালমু। একাকী চিৎকার করে ওঠে সারেঙ। দাঁতে দাঁতে ঘষা লাগে। কর্কশ শব্দ হয়।—দুশমন্যা তরে হালা খতমই করুম আমি। খোদার কছম। ঈশ্বরের নামে একটা নির্মম দিব্বি করে সে।

দৌলতখাঁ থেকে হাতিয়া-সন্দীপ জলপথটা একটা কুটিল চোরা স্রোতে ভয়ানক। এ পথে তাই মাঝিমাল্লারা অতিশয় সতর্ক। চারদিকে সর্বদা কড়া নজর রেখে তবে তারা পাড়ি ধরে। কোথাও চোরা স্রোতের প্যাক কবরের গর্তের মতন হয়ে জলের তলাতক গেছে। কোথাও সেই জল বিঘা দশেক জায়গা নিয়ে ঠেলে উঠেছে ওপর দিকে, কাছিমের পিঠ হয়ে সে জল গড়িয়ে যাচ্ছে চারদিকে। দূর থেকে হঠাৎ মনে হবে একটা চর জেগেছে বুঝি। এই ছুই কুটিল চোরা-স্রোত একটা নিচে যাচ্ছে আর একটা ওপরে উঠছে। এ ছুই স্রোতের হাতে মৃত্যুর পরওয়ানা। চোরা টানের গর্তে পড়লে সব সুদ্ধ জলের তলায় কবর হয়ে যাবে। স্রোতের ঊর্ধ্বমুখ ঠেলায় পড়লে চরকিবাজির মত ঘুরপাক খেয়ে ছিটকে ছড়িয়ে যেতে হবে চার-দিকে। তখন লাশ আর নৌকো আস্ত থাকবে না কিছু। শুধু টুকরো হয়ে ভাসতে থাকবে জলে।

বদর বদর বলে এই পথেই পাড়ি ধরল শুলুক। লস্কররা এক গলায় বলে উঠল সকলে—লায় লাহা ইল্লাল্লা হো মহম্মদের রসুল আল্লা। বদর, ব-দ-র।

সকালবেলা। নীল নির্মল আকাশ সূর্যের অজস্র আলোয় নেয়ে নিশ্চিন্ত। সারেঙ গম্ভীর হয়ে ডেকে পায়চারী করছে। মাশোয়ে ছুটে এল। একটা কি রকম বিহ্বল ভয় চোখে। বড় বড় হয়ে উঠেছে চোখ। চোখে ভরে উঠেছে জল।—আলিজান, তুমি একবার নিচে আস'।

—ক্যান?

—বেদম রক্ত উঠতে আছে।

—আমি কি করুম। আমি কি হেকিম? তুমি বরং থাক' গিয়া কাছে, তোমারে জড়াইয়া ধইরা একটু আরাম পাইব।

আশোয়ে সারেঙের মুখের দিকে চেয়ে কি ভাবল; কিন্তু দাঁড়াল না, যেমন ছুটে এসেছিল, তেমনি ছুটে চলে গেল।

সেদিকে তাকিয়ে সারেঙ একটু হাসল। ইস্পাতের ছুরির ওপরে আলো ঠিকরে পড়লে যেমন হয় সেই রকম হাসল সারেঙ। পাটের রশি দিয়ে গলায় ঝোলান দুরবীনটা চোখে তুলে নিল। ডাইনে বাঁয়ে চোখ ফিরিয়ে দেখল সামনেটা। দেখতে দেখতে মনে মনে ভাবছিল—এতেই হবে। গলা টিপে মারাটারার হাঙ্গামা হুজ্জৎ দরকার নেই। যা হাল বলে গেল তাতে শুলুকটা যদি একটু গা মোচড় দেয় ব্যাস অমনি ফুপ্‌ফুস্ ফেটে সব রক্ত উঠে আসবে, তারপর টেঁসে যেতে কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা। তা সে সময়টা পর্যন্ত দুশমনকে সহ্য করবে সারেঙ।

দুরবীন নামিয়ে জলের রঙ দেখছিল সারেঙ। আবার চোখে দুরবীন লাগাল। দুপুর সূর্যের আলোর তলায়ও নদীটা এক জায়গায় অন্ধকার, ছায়া-ছায়া কালো। ওখানেই তবে জল ফুটছে। পাতালের বাসুকীর ল্যাজের দাপটে জল পাক খেয়ে উঠছে ওপর দিকে।

সারেঙ সুখানির কাছে এল। জল যেখানে ছায়া-ছায়া কালো সেই দিকে আঙুল উচিয়ে হুকুম দিল—সোজা চালাও ওই দিকে!

সুখানি চোখ কুঁচকোল, তার পরেই কি দেখে আঁতকে উঠল। ..... দেখতে পেল বোধ হয়।—ও ত' পানির বেইমান পাক হাবু, গুলুক ওইখানে কি আস্তা থাকব'।

—হাইল সোজা ধর্ ইস্‌মাইল্যা। ধমকে উঠল সারেঙ।

—এতগুলি মানুষের জান মারণের সাধ হইছে?

—এইটুকে জাহাজীগ' জান যায় না। যা কইছি কর্। ট্রাউজারের পকেট থেকে ধেনো মদের বোতলটা বার করে ঢক্‌ঢক্ করে খানিকটা গিলে ফেলল সারেঙ। ঠক্‌ঠক্ করে কেঁপে উঠল সুখানির হাত। পা। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। তবু প্রতিবাদ ফুটল না মুখে। সারেঙের চোখে মানুষের দৃষ্টি নেই। সেখানে দোজখের আগুন জ্বলছে। সুখানি একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল।

ঝলমলে নীল নির্মেঘ আকাশ থেকে হঠাৎ যেন বজ্রপাত হল। হঠাৎ সকলে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, তারপরেই বিপদটা কি বুঝতে পেরে লস্কররা যে যেখানে ছিল চিৎকার করে উঠল খোদা রসুল বাঁচাও। ইবলিশের পিঠ গুলুকের তলায় ঠেকছে, তারে সরাও আল্লা, জানে মাইর' না।

প্রকাণ্ড গুলুকটার তক্তায় তক্তায় একটা আর্তনাদ উঠল। বুঝি তার পাঁজরার জোড় খুলে গেল। একটা মোচার খোলের মত কয়েকটা আছাড় খেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল গুলুক।

উঃ, বড্ড বাঁচা বেঁচে গেল এ যাত্রা। হাঁপ ছাড়ল লস্কররা। কিন্তু পর মুহূর্তেই আবার হাঁপ ধরল। আবার চিৎকার—"খোদা রসুল জান নিও না।" এই ভর দুপুরে একি কাণ্ড! সুখানি সারেঙ ইবলিশটারে দেখতে পায় না। না শয়তানটা বারে বারে ডুব সাঁতার কেটে গুলুকের তলায় পিঠ ঠেকিয়ে খেলা করছে। কি উপায় হবে! ভাবতে ভাবতে আবার টালমাটাল হয়ে উঠল গুলুক। এবার সহসা গুলুকের পাছাটা অনেক আকাশে উঠে গেল, গলুইটা তলিয়ে গেল ঢেউয়ের মধ্যে। জলের মধ্যে থেকে কোন দৈত্য যেন দু হাতে গলুই ধরে টেনে পাতালে নিয়ে যেতে চায়। চোরা

পাক! কবরের টান! কলরব আবার, আবার খোদার উদ্দেশে উচ্চ চিৎকার। কিন্তু ওই শেষ। একটুক্ষণ খুনসুড়ি করল জলের তলার দৈত্যটা জলের ওপরের শুলুকটার সঙ্গে, তারপরে সরে গেল খেলা সাঙ্গ করে। কিন্তু সেই একটুতেই সমস্ত শুলুকটার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে মহাশূন্যে আর অতল জলের মধ্যে আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে মড়মড় মচ্‌মচ্‌ করে উঠল। ভেঙে চুরমার হবার আগেই অবশ্য সামলে গেল। যেতে পারল। তারপর যেমন চলছিল চলতে লাগল শুলুক। সারেঙ হেসে উঠল একটা হিসহিসে সাপের হাসি, বলল—একটু খেল্ হইল মন্দ না, কি কও।

সুখানি তার বুকের মধ্যেকার বাতাসটা (কি জানি কতক্ষণ থেকে চেপে রেখেছিল) সশব্দে বের করে দিয়ে বলল—আমি আর হাল ধরতে পারুম না। আমারে ছুটি দ্যান। আমার মাথা ঘুরতে আছে।

—আরসাইদ্যারে পাঠাইয়া দে গিয়া। নিজে হালে হাত দিয়ে সুখানিকে ছুটি দিল সারেঙ।

আরসাদ এলে সেও হাল ছেড়ে দিল। নিচে একটা অনেক-গলার গোলমাল কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল। ঐ রকম একটা কিছু শোনার জন্য উৎকর্ণ ই ছিল সারেঙ। শুনে খুব খুশি হল। একটা চুরুট ধরিয়ে নিচে নেমে এল সারেঙ। লস্কররা রতনলালের দেহটা টেনে বার করে প্রশস্ত পাটাতনের ওপরে এনে রেখেছে। তার ঠোঁটের কষ বেয়ে তখনও রক্ত গড়াচ্ছে। নিঃসাড় দেহটার দিকে তাকিয়ে বোঝা যায় না মৃত্যুর সময়ে কতখানি লাঞ্ছনা সে ভোগ করেছিল। আধ-খোলা চোখের মধ্যে কালো মণিটা তখনও চকচক্ করছে, তখনও ঠোঁটের কোণে লেগে রয়েছে জীবনের ক্ষীণ আশা। মাশোরে মাথা নিচু করে চুপ করে পাশে বসে আছে।

সারেঙকে দেখে সুখানি একটা হিংস্র কটাক্ষ করল। তার রৌদ্র পোড়া কালো কুৎসিত মুখের বয়োব্রণে এবড়ো খেবড়ো চামড়া একটা বীভৎস বিদ্রূপে কুঁচকে গেল।

সারেঙ হাসল একটা তৃপ্তির হাসি।

মুখখানি লস্করদের কারো বুঝতে বাকি রইল না। কি ভীষণ পশু তাদের সারেঙ! মরেই ত যেত। গুলুকে উঠে অবধিই ত মাথা ঘুরছিল। পেট গোলাচ্ছিল। দৌলতখাঁর আগে থেকে বমি শুরু। বমি আর কী। গলা চিরে কেবল রক্ত। দৌলতখাঁতে যখন গুলুক ভিড়ল তখন থেকেই বাড়াবাড়ি। শেষ রাতের রক্ত ওঠা দেখে মনে হয়েছিল লোকটা তখনই বুঝি মরে। সারেঙের ভয়েই বুঝি মেয়েটা চুপ করে থাকত। তবু তার চাপা কান্না কান এড়ায়নি কোন লস্করের। তারা ত ছুটে ছুটেই আসত। দেখত। আহা বেচারা। বড় কষ্ট পাচ্ছে। ওদেরও কষ্ট হত দেখে। কিন্তু তারা ত জানে না কি করে ওই কষ্ট দূর করা যায়। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু দেখত। অসহ্য হলে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চলে যেত। সেই মরার ওপরে এই খাঁড়ার ঘা কেন হানল সারেঙ? তারা কেউ ভেবে পেল না। এ কোন্ আশ্চর্য হিংস্র খেলা খেলল সে একটা আধমরা মানুষের জান নিয়ে। জানোয়ার! জানোয়ার!

সারেঙ যার মুখের দিকে তাকায় তার মুখেই যেন এই নিঃশব্দ গালটা লেখা দেখতে পায়। সবাই যেন নীরবে চিৎকার করে জানোয়ার বলে ডাকছে তাকে। মাশোয়েও কি তাই ভাবছে, সেও কি বুঝতে পেরেছে কিছু। ভাবে সারেঙ।

সাত

রতনলাল মরে গিয়ে মাশোয়ের বুকের এমন একটা জায়গা খালি করে রেখে গেল যা আর বুঝি কোন কিছুতেই পূরণ হবে না। পূরণ করা যাবে না। রতনলাল যেন তাকে এক মহাশূন্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে। সেই নিরাশ্রয় নিরবলম্ব শূন্য থেকে সে তার আদিজানের বুকে আছাড় খেয়ে পড়ল। তার বুকের মধ্যে আশ্রয় খুঁজতে লাগল মাশোয়ে। আশ্রয় খুঁজতে লাগল।

কখনো মাশোয়ে পাখির মত সারেঙের বুক আঁকড়ে থাকে। কখনো বেড়ালের মত তার কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে দেয়। কখনো ছায়ার মত তার পেছনে পেছনে ঘোরে। সে তাকে চোখের আড়াল করতে পারে না। কিছুক্ষণ সে কাছে না থাকলেই তরাসে অস্থির হয়ে ওঠে মাশোয়ে। নিজেরই বুকের মধ্যেকার একটা অবরুদ্ধ কান্না যেন হঠাৎ সব ঠেলে বেরিয়ে এসে বিভীষিকার মত তার গলাটাকে টিপে ধরে। শ্বাস বন্ধ করে দেয়। জলেপড়া মানুষের মত খাবি খেতে থাকে মাশোয়ে। পাগলের মত অস্থির হয়ে ছুটে বেরিয়ে আসে। সারেঙের গায়ে গা ঠেকিয়ে কাঁপতে থাকে। হাঁপাতে থাকে।

—কি ব্যাপার? আদর করে সারেঙ।—ভয় পাইছিলা বুঝি। ভয় কি! মানুষ মইরা গেলে তার আর কিছু থাকে না। ভূত পেরেত মিথ্যা। মনের ভুল। বস' আমার কাছে। সারেঙ মাশোয়েকে আদর করে বসায়। মাথায় গায়ে হাত বুলোয়।

সারেঙ খুশি। নিশ্চিন্ত। সবাই তাকে খুনে ভাবে। জানোয়ার ভাবে। সবাই জেনেছে, বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা। কিন্তু মাশোয়ে জানে না। সে কিছুই বুঝতে পারে নি। তাই নির্ভয়ে মাশোয়ে তাকে আঁকড়ে ধরেছে। সে-ই এখন মাশোয়ের সব। আশ্রয়। ভরসা। ভবিষ্যৎ। তার দশ বছর আগেকার নরম তুলতুলে বেলেহাঁসের মত মাশোয়ে আবার তার হয়েছে। তার মন টানবার, দৃষ্টি কাড়বার কেউ নেই কাছেপিঠে। পৃথিবীর কোথাও। অনেক কাড়াকাড়ি কামড়া-কামড়ির পরে বিজয়ী বালক তার শক্ত হাতের মুঠোয় লাল টুকটুকে গুল্‌তিটি নিয়ে যেমন করে—কখনো গালে ঘষে, কখনো মুখের মধ্যে ভরে দেয়, কখনো বুক পকেটে রাখে, সেখান থেকে তুলে আবার হাতের মুঠোয় করে, কোথাও রেখে শান্তি পায় না। বারবার চোখের সামনে এনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছাখে—সারেঙ মাশোয়েকে নিয়ে তেমনি করতে লাগল।

এমনি করে দিন রাত্রি ডিঙিয়ে সময় বয়ে চলল। জুলুক হাতিয়া-সন্দ্বীপ থেকে চট্টগ্রাম, সেখান থেকে কক্সবাজার, কক্সবাজার থেকে

আকিয়াবে পৌঁছল। এখানেই তার যাত্রার শেষ। ভারি ভারি নোঙর পড়ল দুপাশে। স্থির হয়ে দাঁড়াল গুলুক। এমনি দাঁড়িয়ে থাকবে কিছু দিন। মাল বোঝাই হবে। তারপর আবার পাড়ি। এবারের দিন চার তো বটেই দিন সাতও হতে পারে—ছুটি। এই শীতের কালটাই গুলুক সমুদ্র পারের দ্বীপে বন্দরে ঘোরে, কাজেই এ সময়ে বড় ছুটি নেই। ছুটি চৈত্রের শেষে কাল বৈশাখীর শুরু থেকে। তখন দীর্ঘ কয়েক মাসের ছুটিতে হাঁপিয়ে মরে জাহাজীরা। সারেঙ ভাবে সেই লম্বা ছুটিগুলি যদি এখন মিলত তার। কিন্তু কুছ পরোয়া নেই। দূরের পাড়িতে যাবে না সে। মাশোয়েকে অপরিচিত জায়গায় একা ফেলে দূরের পাড়ি অসম্ভব। আকিয়াবের গদিতে হিসাবপত্র বুঝিয়ে দিয়ে সারেঙ নামল বাসা খুঁজতে। বাজার রোডে এক বস্তিতে একখানা ঘর পাওয়া গেল। সুবিধাই হল। জেটি থেকে খুব কাছে। মহাজনের গদি থেকেও দূরে নয়।

চর নিউটনের সমুদ্র-উধাও অরণ্য আকাশ এখানে নেই। ফিঙে শালিক ঘুঘু হরিয়ালের ডাক শোনা যায় না এখানে। এখানে দীঘি নেই। তার পাড়ের হিজল জারুল বন-ঝাউ দীঘির কালো জলে বেহেস্তের স্বপ্ন দেখেনা। এখানে আকাশে ধোঁয়া, বস্তির খোপে অন্ধকার। নাকের কাছে কাঁচা ড্রেন। নোংরা জল। থকথকে পোকা। পচা গন্ধ। গুমট অন্ধকার। মশা। মাছি। কিন্তু এ সবই বাইরের জিনিস। মাশোয়ের এসবটাতে কিছু এসে যায় না। সে চায় তার আলিজানের বুকে আশ্রয়। শান্তি। বেহেস্ত বাইরে নয়। ভেতরে। সেই বুকের ভেতরে মাশোয়ে চাইছে বেহেস্তের সুখ। তৃপ্তি। সে তার আলিজানের বুকের মধ্যে শুয়ে তার আট বছর আগেকার জীবনের স্বাদ চেটে চেটে ভোগ করতে চাইছে।

সারেঙেরও মনের মধ্যে পিপাসা। স্বপ্ন: বউ। সন্তান। সংসার। একটা খুশীর সংসারের স্বপ্ন চোখে করে সারেঙ হুট করে মাস তিনেকের ছুটি নিয়ে বসল। দীর্ঘদিন ছুটি নেয়নি রমজানআলি। সে কোনদিন ছুটি চেয়েছে কিনা এ কথাই মনে করতে পারে না তার

মহাজন। তাই মরশুমের সময়ে ছুটি চেয়ে বিব্রত করে ফেললেও মহাজন সব শুনে না করতে পারল না। বউ নিয়ে এসেছে। বউকে সব গোছ-গাছ করে দিতে হবে। নতুন জায়গায় একটু পরিচিত হয়ে উঠতে হবে বউকে। তার জন্যে বউয়ের কাছে তাকে কয়েকটা দিন থাকতে হবে বইকি! কিন্তু তিন তিনটা মাস তার জন্যে কেন যে প্রয়োজন বোঝে না মহাজন। তবু রমজানের পীড়াপীড়িতে ছুটি দিতে হল তাকে।

ছুটি পেয়ে মাশোয়েকে নিয়ে স্ফূর্তির দিন আর রাত্রি আনন্দের ফেনা মেখে কাটতে লাগল সারেঙের। সারাদিন কাটে বাজারে আর রান্নায়—খাওয়ায়। বিকেল কাটে বেড়িয়ে আর সিনেমা দেখে। রাত...

একটা আদিম অরণ্য-ক্ষুধা আছে সারেঙের স্নায়ুতে পেশীতে। জানোয়ারের ক্ষুধা, সে ক্ষুধা প্রস্তুতির প্রতীক্ষা করে না। সবুর মানে না। অন্ধ আবেগে যখন তখন শিকারের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শিকারের হাড় মাংস চিবিয়ে চিবিয়ে খায়। এই খাওয়া প্রয়োজনের খাওয়া নয়। অভ্যাসের খাওয়া। চোখের ক্ষুধার খাওয়া। তাই অতিরিক্ত খাওয়া। দেহ সব সময় এই অতিরিক্ত লোভ সহ্য করতে পারে না। সে অবসন্ন হয়। ক্ষুধামান্দ্য ঘটে তার। বীতস্পৃহা জন্মে। মাত্র তিন মাসেই তাই জন্মাল সারেঙের মধ্যে। ছুটি ফুরোতে না ফুরোতে অবসন্ন হয়ে পড়ল সে। ক্ষুধামান্দ্যের এই চেহারাটার সঙ্গে সারেঙের পরিচয় ছিল না। এই অবসাদের স্বরূপ চিনত না সে।

তার এতদিনকার উচ্ছৃঙ্খল জীবন। কিন্তু কোনদিন এ অবসাদ সে ভোগ করেনি। তার কারণ: সে জাহাজী। তাকে শুলুক নিয়ে বন্দরে বন্দরে ঘুরতে হয়। এক বন্দর থেকে আর এক বন্দরে যাতায়াতের সময়টাতে তাকে বাধ্য হয়ে সংযত থাকতে হয়। সব বন্দরেই যে তার অসংযত [illegible] অবসর বা ব্যবস্থা থাকে তা নয়। তাই মরশুমের সময়টা[illegible] স্নায়ুতে পেশীতে ধীরে ধীরে

তীব্র থেকে তীব্রতর ক্ষুধা জমতে থাকে। সে ক্ষুধা নিবৃত্তির পূর্ণ সুযোগ পাওয়ার আগেই আবার কাজের তাগিদে তাকে জলে ভাসতে হয়। বর্ষার ক মাস যখন সে ডাঙায় থাকে তখনও একেবারে বেপরোয়া হবার অবসর পায় না। মদ আর মেয়েমানুষ পয়সা ছাড়া মেলে না। সে পয়সা সব সময়ই পকেটে থাকে না। তখন বাধ্য হয়ে সংযত হতে হয়। সংযত হতে হয় আবহাওয়া ভাল থাকলেও। কাছে পিঠের বন্দরে তখন শুলুক নিয়ে বেরতে হয়। সংযম এমনি করে বেঁধে রাখে জাহাজীদের। রমজানকেও রাখত। তাই আদিম ক্ষুধাটা সব সময়ই জ্বলন্ত থাকত। এখন আর সংযমের সে বাধ্যতামূলক বাঁধন নেই। নিজের বউকে ভোগ করতে নগদ পয়সা লাগে না। তা ছাড়া মদ ছেড়ে দিয়েছিল সারেঙ। বউ সংসার নিয়ে পুণ্যের জীবন যাপন করবে বলে ও পাপ আর সে স্পর্শ করে নি। তার এ সাময়িক অবসাদের সেও হয় ত একটা কারণ।

অকারণে অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে সারেঙ। খিটখিট করে। মাশোয়ের কোন কাজই এখন আর ঠিক তার পছন্দ হয় না: কথা নেই বার্তা নেই খিল্‌খিল্ হাসে। সময় নেই অসময় নেই পাশে এসে বসে, বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে দেয়। ছেলেমানুষী আবদার করে। খুনসুড়ি করে। বুড়োধাড়ী বউয়ের কাণ্ড দেখে শুধু কেন যেন গা জলে সারেঙের। তার সান্নিধ্যটা ভাল লাগে না। একা একা থাকতে চায় সারেঙ। বেশিক্ষণ আজকাল আর ঘরে থাকে না। বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। জেটিতে, পার্কে বসে। উদ্দেশ্যহীন কেবল পথ হাটে কখনো। এই অবসন্ন অবসর আচ্ছন্ন করে একটা প্রশ্ন বিষের ধোঁয়ার মত জমে উঠতে থাকে তার মনে। অবাক হয়ে সে ভাবে: মেয়েমানুষ জাতটাই বুঝি এই রকম। এমনই। নির্লজ্জ, নিমকহারাম। তিন তিনটে বছর যে মেয়েমানুষটা একটা পুরুষ নিয়ে ঘর করল। যার কঠিন ব্যাধি চিকিৎসার জন্যে সে দেহ পর্যন্ত বিক্রী করেছে, তার মৃত্যুতে সে কিনা এক ফোঁটা চোখের

জল ফেলল না। অনায়াসে, শুধু অনায়াসে নয়, হাসিমুখে আর একজন পুরুষের বুকের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারল। পারল আর এক পুরুষের নিরঙ্কুশ ভোগের পাত্র হয়ে উঠতে।

একদিন এই মেয়েমানুষটা তাকে নিয়েও মেতে উঠেছিল। সব ভুলে বুঁদ হয়ে গিয়েছিল তাকে ভালবেসে। সে যখন চলে এল আর একটা পুরুষকে নিয়ে ভালবাসায় সে তেমনি বুঁদ হয়ে গেল। সেই পুরুষকে মৃত্যু যখন টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল সেখানেই আর সেই মুহূর্তেই সেই মেয়েমানুষটা কিনা তাকে নিয়ে আবার মশগুল হয়ে পড়ল। এ কি করে সম্ভব হয়? রতনলালের মুখের ওপরে অপলক হয়ে তাকিয়ে-থাকা মাশোয়ের চোখের তারায় তারায় সে যা দেখেছে সেকি তবে তাঁরই দেখার ভুল? ভালবাসা, স্নেহ-মমতা মিথ্যে। শুধু দেহটাই সব। সব।

দীর্ঘ আট বছরের উচ্ছৃঙ্খল জীবনে একটা মুহূর্তের জন্যে যে কথা কোনদিন সারেঙের মনে আসেনি আজ সেই কথাটাই ভেবে ভেবে তামাম মেয়ে জাতটার ওপরেই ক্ষেপে উঠল সে। টাকা। টাকা দিলেই ওদের ওই নরম নধর শরীরটার ওপরে যা খুশি করা যায়। টাকা পেলে ওই শরীরটার ওপরে তারা পুরুষকে যা খুশি করতে দিতে রাজী। ওদের মন নেই। হৃদয় বলে কিছু নেই। ওরা একটা রবারের পুতুল মাত্র। পার্থক্য এই যে রবারের শরীরের কোথাও ধুকপুকি নেই। উষ্ণতা নেই। তবু ভাল। তারা বেইমান নয়। মেয়েমানুষগুলি বেইমান মৃত আত্মার প্রতিও তাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। আজ যদি সেও মরে তার মৃত শরীর সামনে করে অনায়াসে মাশোয়ে আর একজন পুরুষের দেহের ওপরে ঝাপিয়ে পড়বে। মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াবে না। একবার শেষ প্রার্থনাটুকু করবে না খোদার কাছে। মাশোয়ে সম্পর্কে এমনিধারা যা খুশি ভাবে সারেঙ। ভাবে: অথচ এর জন্যেই সে একটা মানুষ খুন করে ফেলেছে। একটা দুর্বল মুমূর্ষু মানুষকে। সারেঙ নিজেকে কেবল ছি-ছি করে। ধিক্কার দেয়। একটা লোককে খুন করে রেঙ্গুন আনবার

মত কি ছিল মাশোয়ের মধ্যে। কি পেয়েছে সে মাশোয়ের কাছে। কি দিয়েছে তাকে মাশোয়ে যা অন্য মেয়েমানুষের কাছে দুর্লভ, যা এত কাল সে টাকা দিয়ে পায়নি অন্য মেয়ের কাছে?

আসলে একটা অপরাধ-বোধ সারেঙকে দুর্বল করে ফেলেছিল ভেতরে ভেতরে। সে হত্যাকারী এ সত্যটাই তাকে অনুক্ষণ পীড়িত করছিল। হত্যার মূল্য দিয়ে সে তাই যাচাই করতে চাইছিল মাশোয়ের মূল্যকে। আর সে জন্যেই মাশোয়ে ক্রমশ মূল্যহীন হয়ে উঠছিল সারেঙের কাছে। একটা শস্তা সাধারণ মেয়ে হয়ে উঠছিল। অথবা মাশোয়ের কাছে এলেই, মাশোয়ের দিকে তাকালেই, তার আদর কাড়তে গেলেই সে যে হত্যাকারী এ কথাটা তার বড় বেশি করে মনে পড়ত। মাশোয়ের কাছে নিজেকে অতিশয় হীন ঘৃণ্য বলে মনে হত। মাশোয়ে তাই তার অসহ্য হয়ে উঠেছিল দিন দিন। আর সে জন্যেই সে কেবল মাশোয়ের দোষ খুঁজে বেড়াত। সামান্য দোষ-ঘাটে রেগে উঠত। হঠাৎ চটে উঠে মেজাজ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যেত। নিজের মনের মধ্যেকার এই অপরাধবোধই এমনি করে মাশোয়ের কাছ থেকে তাকে ঠেলে ক্রমশ তাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছিল। অথচ দূরে সরেও সে যেতে পারছিল না। মাশোয়ের সঙ্গে একটা অদৃশ্য অচ্ছেদ্য বন্ধন সে অনুভব করত। মেয়েটাকে ত সে-ই লোভের বশে তার নিজের দেশ আশ্রয় থেকে ছিঁড়ে উপড়ে এনেছে। এখন তাকে ফেলে পালায় কি করে। এক অপরাধের পীড়নেই সে অস্থির আর এক অপরাধ করতে সে ভয় পায়। এই ভয় মাশোয়ের সঙ্গে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। এই ভয় আবার মাঝে মাঝে তাকে মাশোয়ের কাছ থেকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। গলা টিপে ধরছে তার।

ছুটি ফুরিয়ে গেলে তাই সারেঙ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মাশোয়ের থেকে দূরে যেতে পারছে, দূরে থাকতে পারছে। অথচ স্বেচ্ছায় নয়। কর্তব্যের জন্যে। বাধ্য হয়ে। এই কৈফিয়তের আড়ালে আশ্রয় পেয়ে অনেকটা সুস্থ বোধ করল সারেঙ।

কিন্তু মাশোয়ের দিন অচল হয়ে উঠল। মাঘের ছোট্ট-দিন যদি বা গড়াতে গড়াতে পার হয়ে যায়, শীতের রাতটা একা বিছানায় আর কাটতে চায় না। কি ছিল কি হয়েছে, কোথায় ছিল, কোথায় এসেছে সেই ভাবনাতেই অনিদ্রার রাত্রি ছটফট্ করে কাটে তার। শুধু রাতে নয় দিনেও। দিন-রাত্রি ব্যাপীই এখন তার সেই চিন্তা। কি চেয়ে ছিল, কি পেয়েছে সে। কি পেয়েছিল কি হারিয়েছে সে। দিনরাত তারই হিসাব-নিকাশ করে মাশোয়ে। হিসাব মেলাতে পারে না। যোগ-বিয়োগে ভুল হয়, জমা-খরচে গোলমাল হয়ে যায়। চোখ ফেটে জল আসে।

এই তার আলিজান। সতর বছরের কুমারী মনে যে বেহেস্তের ফেরেস্তা হয়ে এসেছিল। যাকে নিয়ে সে পৃথিবীর এক প্রান্তে পাতার কুঁড়েতে স্বর্গ পেয়েছিল। আর এক দিন যাকে হারিয়ে দুঃসহ অন্তর্দাহে পুড়ে পুড়ে খাক্ হয়েছিল। সেই পোড়া মনকে তবু সে বাঁচিয়ে রেখেছিল—পাতার কুঁড়ের সুখের স্মৃতি বুকে করে পথ চেয়ে ছিল, আবার তার আলিজান আসবে। আবার সে তাকে বুকের মধ্যে পাবে। তার সেই বিশ্বাস, সেই আশা পূর্ণ হল। কিন্তু যেমন করে সে চেয়েছিল তেমন করে কই হল না ত। আলিজানকে সে পেল, কিন্তু যে আলিজানের স্মৃতি নিয়ে সে তার বিরহের দিনগুলি পার হয়েছে তাকে ত পেল না। আলিজানের মধ্যে সেদিনকার সেই মানুষটি কোথায় গেল! চৌত্রিশ বছরের মানুষটির মধ্যে সাতাশ বছরের মানুষটিকে খুঁজতে থাকে মাশোয়ে: কথায় কথায় সেই প্রাণ খোলা হাসি। ক্ষণে ক্ষণে সেই বুকের মধ্যে সাপটে টেনে নেওয়া। কাজের ফাঁকে ফাঁকে খুনসুড়ি করা। বনে ছুটোছুটি। দীঘিতে হুটোপুটি। নদীতে অনির্দেশ ভেসে চলা। দুটি প্রাণের সেই নিবিড় সান্নিধ্য কই! কই সেই উত্তাপ! আলিজানকে আবারকরে পেয়ে সে ত সেদিনের সেই মাটির স্বর্গকেই চেয়েছিল। কিন্তু কি পেল! কি পাচ্ছে! কয়েকটা মাসের উন্মাদ উত্থিত ক্ষুধার আশ্লেষ, উত্তেজিত জোয়ারের ধাক্কা ছাড়া আর কিছু কই? তবু তার মধ্যে প্রথম প্রথম

একটা নীড় বাঁধার আগ্রহ, সংসার পাতার প্রেরণা, সুখী হবার ইচ্ছা অনুভব করেছিল মাশোয়ে; কিন্তু বিকেল বেলাকার রোদের মত সন্ধ্যার আবছায়ায় তা ঢেকে যেতে বিলম্ব ঘটল না। পূর্ণিমার কূল ছাপান জোয়ার প্রতিপদ আসতে না আসতেই কুৎসিত কাদার মধ্যে ফুরিয়ে গেল। কাদাই চারদিকে আজ। যে দিকে যায় কাদা লাগে পায়। কাদা লাগে হাতে। সর্বাঙ্গ যেন কাদা মাখা হয়ে গেল মাশোয়ের। কাদা ছাড়া কি! অশান্তি' ত কাদাই।

নীড় বাঁধার স্বপ্ন নীড় ভাঙ্গার শব্দে উড়ে গেল। দুমদাম করে পা ফেলে আজকাল আলিজ্জান। চিৎকার করে কথা বলে। গাল পাড়ে। কিছুই আজ আর তার পছন্দ নয়। পদে পদে দোষ মাশোয়ের। কথায় কথায় অপরাধ। বেড়াতে বেরোতে ভুলে গেছে আজকাল সে। বায়স্কোপ দেখার নামও করে না। কাছে বসতে চায় না এক মুহূর্ত। বাড়িতেই থাকতে চায় না। যে টুকু ক্ষণ থাকে ছট্‌ফট্‌ করে। পালায়। পালাতে পারলে বাঁচে। মুখের দিকে চায় না। ভাল করে একটা কথা বলে না পর্যন্ত। মাশোয়ের গায়ে যেন আজকাল কাঁটা হয়েছে, পাশে শুয়ে কেবল উস্‌খুস্‌ করে। যেন কোনমতে রাতটা কাটাতে পারলে বাঁচে। কেন এমন করছে আলিজ্জান। কেন এমন হচ্ছে দিন দিন। জোর করে ওর কোলে মাথা রাখলে ঘাড় ধরে তুলে দেয়। হেসে কথা কইলে ধমকে ওঠে। কাছে বসতে গেলে উঠে চলে যায়। কি অপরাধ করেছে মাশোয়ে। কোথায় দোষ তার। মুখ ফুটে বলে না কেন কিছু। এর থেকে ধরে মারত যদি। বেদম মারত। এলো পাথাড়ি। হয় ত তাহলে মাশোয়ের ওপর ওর রাগটা পড়ত, রাগ পড়লে আবার হয় ত আদর করত। বুকে তুলে নিত। কিন্তু তা নয়। সে পালিয়ে পালিয়ে ফেরে। দূরে দূরে থাকে। ফুলে ফুলে কাঁদে মাশোয়ে। একা বিছানায় ছট্‌ফট্‌ করে, কেবল চোখের জলে বালিস ভিজায়।

কাজের মানুষের ছুটি, বিশ্রাম বুঝি সয় না। মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। মেজাজ বিগড়ায়। ছুটি ফুরিয়েছে। ভালই হয়েছে।

মাশোয়ে ভাবে মাঝে মাঝে : কাছে পিঠে পাড়ি। দুদিন পাঁচদিন পরেই ঘুরে আসে। দু তিন দিন থেকে যায়। মেজাজ তখন খুব খারাপ থাকে না। সহ্য করা যায়। আরও ভাল হবে। আগেকার মত খোস-মেজাজ আবার ফিরে আসবে, আশা করা যায়। আশা করেও মাশোয়ে। আলি ছাড়া তার যে আর কেউ নেই। সে যদি এমন ঘর-বিবাগী ছন্নছাড়া হয়ে ওঠে কাকে নিয়ে সে তার মাটির স্বর্গ গড়বে!

মাটিতে স্বর্গ গড়বে তারা। তাই বলেই ত সে আলিজানের সঙ্গে এসেছে। তাই বলেই ত আলিজান তাকে নিয়ে এসেছে; কিন্তু তার সেই কথায় আর কাজে দিন দিন ফারাক হয়ে যাচ্ছে। দরিয়ার দুই পারের মত ফারাক। এর শেষ কোথায় ভেবে শিউরে ওঠে মাশোয়ে। তার ভাগ্যের আকাশে ধোঁয়া ধোঁয়া মেঘ দেখে যেন সে। সে চোখ বোজে। মুখ ফিরায়। এ-সব সময়তেই ভয় মাশোয়ের। তখন আলিজানের স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে মেতে ওঠে সে। সংসার নিয়ে ডুবে থাকতে চায়। মনের অনেক গভীরে রতনলালের চিন্তাকে সে কবর দিয়ে রেখেছে। তার জীবনে রতনলাল একটা প্রক্ষেপ। একটা অবান্তর অধ্যায়। সে অধ্যায় সে ভুলে গেছে। ভুলে থাকতে চাইছে। তাই যখনই কোন মানসিক আলোড়নে রতনলালের কবরের ধুলো উড়তে থাকে, কবরের মাটি সরে যায়, মনের আকাশ অন্ধকার হয়ে শেষে রতনলালের অশরীরী মূর্তি শরীরী হয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় তার, সে তাকে আবার জোর করে কবর দেয় মনের অনেক তলায়। আর নিজেকে তলিয়ে দেয় সংসারের কাজে। আলিজানের চিন্তায়।

কাজে যোগ দিয়ে মাত্র মাস দেড়েক কাজ করতে পেল সারেঙ। দেখতে দেখতে হাওয়া দিক বদলাল। উত্তুরে হাওয়া শীতের রদ্দুরে পিঠ করে আর নদীর বুকে আলসেমি করে না। হঠাৎ যেন সে চটপটে হয়। জরাগ্রস্ত যেন নওজোয়ান হয়ে ওঠে।

দিক পালটেছে হাওয়া। ভোল পালটেছে। ঝড়ের পিঠে চড়ে সে হু হু করে ছোটে। মাথায় থাকে তার মেঘের ফেজ। হাতে থাকে তার বিদ্যুতের ছড়ি। আকাশ-সমুদ্র তোলপাড় করে সে শিস দিয়ে

চলে। অরণ্য মাটি মানুষ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠে। হি হি করে হাসে হাওয়া। ফাল্গুন মাসের শেষে সমুদ্রের দিকে, মোহনার দিকে আর তাকান যায় না। তারাও যেন মেতে ওঠে। আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে হাত তালি দেয়। জলের ওপরে তখন যা পায় তাই নিয়ে লোফালুফি খেলতে শুরু করে। শুলুক সাম্পান কেন, তখন জাহাজও না। চলতে পারে না কোন কিছুই সে জলের ওপর দিয়ে। অমন যে দুঃসাহসী জেলে ডিঙি তাও পর্যন্ত পাড়ের থেকে বেশি দূরে এগুতে সাহস পায় না।

শুলুক জেটিতে বেঁধে পাল গুটিয়ে নঙর ফেলে মাস ছয়েকের জন্যে সারেঙ ঘরে ফিরে এল।

এখান থেকেই চরম দুঃখের দিন শুরু হল মাশোয়ের। দুটো রাতও হয় ত এক বিছানায় কাটল না তাদের! সারেঙ উধাও। প্রথম রাতটা মাশোয়ের চিন্তার অবধি ছিল নাঃ কোথায় কি বিপদ ঘটল যার জন্যে সে ফিরতে পারল না রাতে। কোথায় কোন্ দূরে গেল যে রাত হয়ে গেল বলে এল না। দূরে গেলে নিশ্চয় সে বলে যেত। কাছে পিঠে গিয়েছে। ফিরতে পারছে না, নিশ্চয় কোন বিপদ ঘটেছে। উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ভেবেছে মাশোয়ে। কিন্তু কাকে বলবে। কে খুঁজবে তার হয়ে তার আলিজানকে। একবার ঘর একবার বার করে রাত কেটে গেল তার। ভোরেও ফিরল না সারেঙ, ফিরল দুপুরে। মাতাল হয়ে। মাশোয়েকে নিয়ে এসে থেকে এই প্রথম মদ খেল সারেঙ। দুটো চোখ বড় বড় করে ভয়ে জড়সড় হয়ে মাশোয়ে সব কাজ করল। তাকে চান করাল, খাওয়াল। ঘুম পাড়াল। সুবোধ ছেলের মত মাশোয়ের সেবার হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে যেন একটু তৃপ্তিই পাচ্ছিল আলিজান, মনে হল মাশোয়ের। তবু ভাল। তবু আনন্দ। সেবা করবার অধিকার পেয়েছে সে। সেবা দিয়ে মমতা দিয়ে সে এমনি করে জয় করবে তার আলিজানকে। আবার সে ফিরে পাবে তাকে। ফিরে পাবে তার স্বপ্নের দিন। নানা রঙের দিন।

কিন্তু না। পুরনো দিনে আর ফিরে যাওয়া যায় না। যে দিন যায় সে দিন আর ফিরে আসে না। স্মৃতি মিথ্যে। সুখ-স্বপ্ন প্রবঞ্চনা।

তবু মাশোয়ে নিজেকে সেই মিথ্যেতে, সেই প্রবঞ্চনাতে ডুবিয়ে রাখতে চায়। তলিয়ে যেতে চায়। কিন্তু যা চাওয়া যায় তা পাওয়া যায় না। সেবা-শুশ্রূষা করবার সুযোগও মাশোয়ে পায় না সবদিন। সারেঙ কোনদিন আসে কোনদিন আসে না।

মাশোয়ে প্রথম দিকে তাকে খুঁজতে বেরোত। কখনো ভাটিখানা থেকে কখনো কোন বিশেষ পল্লী থেকে ধরে নিয়ে আসত। কোথাও না পেলে অস্থির হয়ে উঠত। এখন আর অস্থির হয়ে ওঠে না। ঘর বার করে না মাশোয়ে। খুঁজতেও বেরোয় না। হাত পা গুটিয়ে ঘরের মধ্যে নিঃসাড় বসে থাকে। দু চোখ বেয়ে কিছুক্ষণ জল গড়ায়। তারপর শুকিয়ে যায়। শুধু লোনা জলের একটা গাঢ় দাগ চোখের কোল থেকে গাল গলা অবধি চক্ চক্ করে। হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে যদি-বা কখনো ওঠে মাশোয়ে দোর গোড়ার বেশি আর এগোয় না। শূন্য চোখে পথের পানে খানিক চেয়ে থাকে। শেষে নিঃশব্দে ফিরে এসে যেমন বসেছিল তেমনি বসে থাকে আবার। নিয়মিত খাওয়াদাওয়া নেই। রাঁধা-বাড়া বন্ধ। কার জন্যে রাঁধবে। নিজের জন্যে কিছু করতেই মনের মধ্যে তাগিদ বোধ করে না। শুকনো এঁটোয় মাছি পড়ে। অন্ধকার ভ্যাপসা ঘরে মশা ওড়ে। ধুলো জঞ্জাল জমে চারধারে। কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ থাকে না মাশোয়ের।

কোনো দিন আসে সারেঙ। কোনো দিন আসে না। এমনি করে চৈত্র মাসটা কেটে যায় মাশোয়ের। বৈশাখ মাসটা আর কাটতে চায় না। পনর দিন হয়ে গেল আলিজান আসে না। এই পনর দিনে দাঁতে কুটোগাছটি কাটেনি মাশোয়ে। একবিন্দু ঘুমোয় নি। অনাহারে অনিদ্রায় চিন্তায় মাশোয়ের স্নায়ু দুর্বল হয়ে পড়েছে। দাঁড়ালে মাথা টলে। বসলে মাথা ঘোরে। শুলে দুলতে থাকে সমস্ত পৃথিবীটা। সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে মাশোয়ের। অশক্ত অবশ মনে আর সেই জোর নেই যাতেকরে রতনলালের চিন্তাকে সে চাপা দিতে পারে। ঠেলে সরিয়ে দিতে পারে তার ছবিটা বুক থেকে। সব ছাপিয়ে সব ছাড়িয়ে, এই অনাহার এই অনিদ্রা তার এই জীবন জগৎ

সব মিছে করে দিয়ে, রতনলালের ভাবনা মূর্তি ধরে এসে মনের মধ্যে বসে। কিন্তু কিছুই ভাবতে পারে না মাশোয়ে। শুধু ছবিটার দিকে তাকিয়ে বোবা হয়ে থাকে। বুকের মধ্যেটা কেবল বারবার মোচড় খায়। কি সব ভেঙেচুরে যেতে থাকে সেখানে। সে ভাঙাচোরা থেকে বুঝি রক্ত ঝরে। লোনা জল হয়ে তারই কয়েক ফোঁটা বেরিয়ে আসে চোখের কোণ বেয়ে। তখনই আবার শুকিয়ে যায়।

মানুষের দুঃখের হয় ত শেষ নেই। কিন্তু চোখের জলের আছে। সে ফুরোয়। মাশোয়ের চোখের জলও ফুরিয়ে গেছে।

মাশোয়ের শুকনো চোখ এখন কেবল করকর করে। এক দুঃসহ দাহে জ্বলতে থাকে ঘোলা ঘোলা চোখের মণি। এলোমেলো দৃষ্টিতে নিজের চারধারে বারে বারে তাকায়। বিড়বিড় করে কি বকে। কোমল গলায় কাকে যেন শান্ত করে। সান্ত্বনা দেয়। আবার রাগ করে চটেও ওঠে। কঠিন কণ্ঠে ধমকও দেয়। মধ্যে মধ্যে আবার হেসে ওঠে ফিক্‌ফিক্ করে। কি যেন একটুক্ষণ কান পেতে শোনে। শুনে লাল হয়ে ওঠে। শাসনের ভঙ্গীতে আঙুল নাড়ে। তারপরেই হঠাৎ যেন দৃশ্য পালটায়। হাসিহাসি মুখখানি বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। ভয়ে-ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। মাথাটা মাটিতে ঠেকিয়ে বাইরে তাকায়। যেন কোন ছোট্ট জানালা কি ফোকর দিয়ে আকাশ দেখে। দেখতে দেখতে কপাল কুঁচকে যায়। বুঝি ভাবে আকাশ এত নীল, রোদ এত কড়া তবু লস্করেরা খোদা রসুল বলে চেঁচাচ্ছে কেন। ভ্রূ কুঁচকায়। খিলখিল করে হেসে ওঠে।

চর নিউটনের মাশোয়েকে আকিয়াব বাজারের এই বস্তিতে আজ কেউ চিনতে পারবে না। কার্তিক মাসের মাশোয়ের চেহারা বৈশাখ মাসে এমনই বদলেছে। তবু পাঁচ মাসে। মাত্র পনর দিন আগে নিত্যানন্দ বাবুর শুলুকের সারেঙ রমজানআলিকে যে দেখেছে আজ

সে-ই কি তাকে চিনতে পারবে। বুথিডং নদীর অন্য পাড়ে এক ভাটিখানার খড়ের চালের নিচে ওই ত মাদুরের ওপরে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। বেহুঁস। মাথায় ব্যাণ্ডেজ। একটা চোখ ব্যাণ্ডেজের মধ্যে ঢাকা। খোলা চোখটা ফোলা। বোজা। ব্যাণ্ডেজের অনেকটা জায়গা নিয়ে একটা গাঢ় কালচে বাদামী দাগ। দাগের চার দিকটা শুকনো মাঝখানটায় খানিকটা জায়গা ভিজে ভিজে। বোধ হয় ওই খানেই ঘা। ঘা থেকে বোধ হয় এখনও চুঁইয়ে চুঁইয়ে রস গড়াচ্ছে। এখন বেহুঁস। আবার যখন হুঁস হবে সামনের বোতল তুলে খানিকটা মদ ঢক্ ঢক্ করে ঢালবে গলায়। আবার বেহুঁস হবে। প্রথম কদিন এমন ছিল না। উত্তেজনায় সে কেবল লাফাত। চেঁচাত।

এ ভাটিখানা শুধু মদ সরবরাহ করে না। মেয়েমানুষও। তাই নিয়েই হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে সারেঙ: মাগী ছাগী হটাও। এই তার প্রথম চিৎকার।

—সমুন্দি, আমার ফেরেস্তার বাচ্চা রে। ব্যঙ্গ করে ওঠে একজন।

—হটাও। সারেঙের গলা আর এক পর্দায় চড়ে।—মাগী না শূয়রের গোস্ত, দোজখের কাবাব। হটাও। একটা মদের বোতল নিয়ে তেড়ে আসে সারেঙ। একটা লোক একটা মেয়েমানুষ নিয়ে বেলেল্লাপনা করছিল। সারেঙ সেই দিকে ছুটে গেল। মেয়েমানুষটা লোকটার বুকের ওপরে পড়ে ইনিয়ে বিনিয়ে সোহাগ জানাচ্ছিল। সারেঙ সেখানে এসে মুখ খিঁচিয়ে একটা অশ্লীল উক্তি করতেই মেয়েমানুষটা তার পুরুষটার গালে এক চড় মেরে বলল—বেইজ্জতি করতে আমারে আনছ' এইখানে।

পুরুষটার পৌরুষে আঘাত লাগল। সে লাফ দিয়ে উঠে একটা মদের বোতল টেনে মারল সারেঙের মাথায়।··

একটা হৈচৈ মারামারির পরে সব যখন আবার আগের মত হল দেখা গেল সারেঙ একটা খড়ের চালার তলায়। মাথায় ব্যাণ্ডেজ। সামনে মদের বোতল; কিছু শিক কাবাব আর ডাল ভাজা। চারদিকে মাছি ভন ভন করে উড়ছে। বেহুঁস সারেঙের ঠোঁট নাক চোখ খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে মাছি।

কখনো ধীরে। কখনো দ্রুত। কখনো ভালর দিকে। কখনো মন্দর : মানুষ বদলায়। পৃথিবী বদলায়। মাথার ওপরকার নির্জন আকাশটাও এক রকম থাকে না। নিত্য নতুন রঙ ফোটে, রঙ ঝরে। একদিন তার মেজাজ শান্ত সুন্দর। আর একদিন ভ্রূকুটি-ভীষণ। কখন সে অজস্র আলোয় স্বর্গের আশীর্বাদ পাঠায় মাটিকে। কখনো জ্যোৎস্নার সহস্র ধারায় পাঠায় নন্দনের আনন্দ। সেই আবার একদিন নরকের আগুনে জ্বলে ওঠে। ক্রূর আক্রোশে ফেটে পড়ে। সমস্ত পৃথিবীটাকে লণ্ডভণ্ড করে দিতে চায়।

যেমন আজ সন্ধ্যায়। সারা দিন আকাশের নাল-নির্জন জুড়ে ছিল নির্মল আলো। বিকেল হতেই সেই নীল বিষিয়ে উঠল কি এক রোষে। ঈশান কোণে এক টুকরো মেঘ ঘুমোচ্ছিল। হঠাৎ সে-ই পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে আকাশ ছেয়ে ফেলল। যেন ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত কতগুলি বুনো মোষ ছুটে এসে ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। তাদের খুরে খুরে দুঃস্বপ্ন ঘুলিয়ে উঠল আকাশে। লেজের চাবুকে চমকাতে লাগল বিদ্যুৎ। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে পাক খেয়ে উঠতে লাগল ঝড়ের হাওয়া।

বেহুঁস সারেঙের চমক ভাঙল যখন তার মাথার ওপরকার খড়ের চালাটা ঘুড়ির মত উড়ে উঠে গেল আকাশে। সামনে কোথায় কড়-কড় করে একটা বাজ পড়ল। আতঙ্ক-পাণ্ডুর মানুষ প্রাণপণে আশ্রয়ের আশায় ইতস্তত ছুটাছুটি করছিল। নির্বিকার দাঁড়িয়ে থেকে সারেঙ হো হো করে হেসে উঠল—পলাইয়া যাইবা কই, হারামির পুত্‌রা? কেয়ামতের দিন আইজ। খোদা বইছেন দরবারে। আইজ শেষ বিচার হইব'।

আজ শেষ বিচারের দিন। নিজের কথাটা নিজের কানে যেতেই সারেঙ চমকে ওঠে। খোদা যখন জিজ্ঞেস করবে—রমজান তুই রতনলালকে কেন খুন করেছিলি? কি উত্তর দেবে সে তার? ছোয়াকে সুখী করবে। নিজে সুখী হবে। সেইজন্যই ত রতনলালকে খুন করেছিল; কিন্তু সে কি ছোয়াকে সুখী করেছে, না নিজে সুখী হতে পেরেছে। একটা খুনের দাম দিয়ে সে একটা মেয়ের দাম যাচাই

করতে চেয়েছে। উঃ কি ভুল সে করেছে। একলা ঘরে ছোয়াকে ফেলে কোথায় সে দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণে হয় ত ঝড়ের ঝাপটায় ঘর চাপা পড়ে চিল্লাচ্ছে ছোয়া।

সারেঙ ছুটতে আরম্ভ করল। ছুটতে সে অবশ্য আর পারছিল না। কোন মতে টলতে টলতে চলছিল। ঝড়ো হাওয়া, উড়ন্ত খড়কুটো। পিচ্‌কালো অন্ধকার। তারই মধ্যে টলতে টলতে পথ চলছে সারেঙ। রাস্তার দুপাশে ছোট বড় নানা গাছ। কারো ডাল ভাঙছে। কেউ একেবারে মূল সুদ্ধ উপড়ে পড়ছে। এমনি একটা উপড়ে-পড়া গাছে সারেঙের পা বেধে গেল। সে পড়ে গিয়ে গাছটাকে জড়িয়ে ধরল। বিড়বিড় করে বলতে লাগল—ছোয়া, আমি আইছি, তোমারে ছাইড়া আর আমি কোনখানে যামু না, কোন দিন না।

ঝড়। শেকল ছেঁড়া একদল দানো যেন একপাল শকুনের পিঠে চড়ে, আকাশ মাথায় করে দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছে। সমুদ্র মাটি থরথর করছে সে দাপটে। সব ছারখার ছত্রখান হয়ে যাচ্ছে। মানুষের শত যত্নে গড়া ঘর ঘরণী সন্তান ভবিষ্যৎ—ঝড়ের এক একটা ফুৎকারে পলকা প্রদীপের শিখার মত নিভে যাচ্ছে।

মাশোয়ে তার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। দেখছে। রাস্তার বাতিগুলি ক্ষণেক্ষণে দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলে উঠছে। নিভে যাবার আগে সমস্তটুকু প্রাণশক্তি এক করে বেঁচে থাকার কি প্রাণান্ত চেষ্টা। সেই চেষ্টাকে এক একটা নির্মম ফুৎকারে নিভিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ঝড়ের বাতাস। দেখতে দেখতে সমস্ত রাস্তা, যতদূর দৃষ্টি যায় সব অন্ধকার।—অন্ধকারে লেপা মোছা হয়ে গেছে সব। আকাশে বিদ্যুৎ ক্ষণে-ক্ষণে পৃথিবীর দুর্দশা দেখে হাসছে। হাসছে চতুর্দিক থেকে ঝড়ের দানোগুলো। গাছগাছালি ভেঙে উপড়ে, ঘর বাড়ি উড়িয়ে ছড়িয়ে, নির্মম খেলা চলছে তাদের। গাছের ডালে পাখির বাসা লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে। পাখিগুলি ঝড়ো হাওয়ায় মরা পাতার মত কোথায় উড়ে যাচ্ছে। ঘর চাপা পড়ে কত শিশু মা একটা আর্ত চিৎকার করে উঠবার আগেই নিঃসাড় হয়ে যাচ্ছে।

মাশোয়ের চোখ ক্রমশ বড় হচ্ছে। গোল। ঠিকরে বেরিয়ে আসছে যেন। ঝড়ো হওয়ার শাসানি, মেঘের গর্জন, চতুর্দিককার ভয়ংকর শব্দ সাড়ার মধ্যে থেকে, তাকে ছাপিয়ে একটা অতিক্ষীণ কাতর স্বর ভেসে আসছে। আছড়ে পড়ছে মাশোয়ের কানের পর্দায়। বুকের মধ্যে।

: কে, কে কাঁদছে, ডাকছে তাকে?

ডাকছে, তাকে ডাকছে। ওই মোহনার মধ্যে থেকে, গহিন জলের তলা থেকে, বুঝি ডাকছে তাকে, রতনলাল ডাকছে না? একা থাকতে পারছে না সে। তার ভয় করছে।—আইতে আছি, লাল, আমি আইতে আছি। ভয় কি এই ত' আমি!

হঠাৎ মাশোয়ে ঝড়ের মধ্যে পাগলের মত ছুটতে শুরু করল। জাহাজঘাটার দিকে তড়িৎগতিতে ছুটে চলল মাশোয়ে। মুখে তার ওই এক কথা: আইতে আছি আমি, এইত্ত আইয়া পড়ছি, ভয় কি?

একটা বাসা-ভাঙা পাখি এক টুকরো তুলোর মত ঝড়ের আকাশে পাক খাচ্ছিল। তার ছোট্ট বুকটার আকুল ধুকপুকি কান্না হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছিল চারদিকে। কোন দিকে উড়ে পালাতে পারছিল না সে। যে দিকেই যেতে চাইছে ঝড়ের হাওয়া ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিচ্ছে। শূন্যেই আছাড় খাচ্ছে বারবার। ওলট পালট খাচ্ছে। ডানা শিথিল হয়ে আসছে। তবু। তবু তার সে কী বাঁচার সংগ্রাম। ক্লান্ত ডানার শেষ শক্তিটুকু এক করে সে উড়ছে। এক ফোঁটা পাখির এই ঔদ্ধত্য বুঝি সহ্য হল না ঝড়ের শকুনিটার। প্রচণ্ড এক ফুঁয়ে সে তাকে তালগোল পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল মহাশূন্যে। একটা শুলুকের মাস্তুলে আছড়ে পড়ল পাখিটা। সেখান থেকে একটা বোঁটা-ছেঁড়া ফলের মত পাক খেতে খেতে জেটির জলে পড়ে গেল ঝুপ করে।

কাল বৈশাখীর ক্ষেপামিটা মধ্য রাতেই মিইয়ে এল ধীরে ধীরে, ক্লান্ত ঘুমে এলিয়ে পড়ল ঝড়ের ডানা।

পরের দিন আবার সূর্য উঠল। আকাশ লাল হল। লোনা জল লাল হল। পথে বেরিয়ে এল মানুষ। বেঁচে থাকার তাগিদে কাজে ডুবে গেল। এক সময়ে তারা ভুলেই গেল, কাল রাতে ভয়ানক তুফান উঠেছিল।